সেফ ল্যাণ্ডিং

শ্রীপারাবত

মণ্ডল বুক হাউস ।। ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড ।। কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৪৮ সাল

প্রকাশিকা
শ্রীমতী শান্তিরাণী মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯

পুস্তকের সর্বস্বত্ব
শ্রীমতী বাণী গোস্বামী
কর্তৃক সংরক্ষিত।

Uttarpara Jaikrishna Public Library
Accn. No. ১০৭১৫ Date. ২০.১২.৮৩

দশ টাকা

উৎসর্গ

শ্রীসুধাংশু শেখর দে

প্রীতিভাজনেষু

লেখকের অন্য বই :

আমি সিরাজের বেগম

মমতাজ দুহিতা জাহানারা

রাজপুত নন্দিনী

আরাবল্লী থেকে আগ্রা

নির্জনতা নেই

স্বর্ণালী সন্ধ্যা

যে জীবন দীন

আহির ভৈঁরো

জনক রোডের আলতাদির সঙ্গে আমার পরিচয় একটি লাল চক্‌চকে ক্রিকেট বলের দৌলতে। সেই বলটা আজ পেলে আমি কাঁচের শো-কেসের মধ্যে প্ল্যাটিনামের সিংহাসনের ওপর রেখে রোজ ধূপ-ধুনো দিয়ে ধন্য হতে পারতাম। কিন্তু সময় বড় বেশী সরে গিয়েছে। বলটির অস্তিত্ব যদিও থাকে, এখন আর চেনার উপায় নেই। কিংবা সেটি লেকের জলের মধ্যে কোনো একদিন গড়িয়ে পড়ে ভাসতে ভাসতে অন্য পাড়ে গিয়ে ঠেকেছে।

কোথায় কসবার বস্তীসংলগ্ন ভাঙা একতলা বাড়ির বেকার তরুণ দীপ্তেন বোস, আর কোথায় আলতাদি। আমি যদি হই চর্বি-মোম-বাতির আলো, আলতাদি তবে স্নিগ্ধ চাঁদ। আমি যদি হই একমুঠো ধূলিকণা, আলতাদি তাহলে এক চামচ ইউরেনিয়াম। আমি পাতকুয়োর ঠাণ্ডা জল হলে আলতাদি নিঃসন্দেহে হেভী ওয়াটার।

তবু সেই উজ্জ্বল ক্রিকেট বলটি অঘটন ঘটিয়ে দিল। আর আমার জীবন ও যৌবনের ওপরের যত সব চাপা হতাশা এক মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাতের মতো কোথায় উধাও হয়ে গেল। আমি দেখতে পেলাম সুন্দর আকাশ দেখলাম স্বচ্ছ লেকের জল টল্‌টল্‌ করছে। গাছে গাছে দু'একটা পাখীও যেন শিষ দিচ্ছে।

বসেছিলাম লেকের ধারে। শীতের দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে কিছুটা। পেছনে দুজন তরুণী উইকেট পুঁতে ক্রিকেটের ব্যাট বল নিয়ে প্র্যাক্‌টিস করছে। তাদের একজনকে দেখতে এত ভালো যে হাঁ করে তাকিয়ে থাকাটা নিরাপদ মনে করলাম না। সঙ্গে আমার দলবল কেউ নেই। তবে অতি ঘন ঘন ওদের খেলার উত্তেজনার হাসি কানে আসার সাথে সাথে আমার ঘাড় অটোমেটিক ঘুরে যেতে থাকল। ঠিক যেন ইলেক-ট্রনিক কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্রের কারসাজি। ওদের হাসি আর আমার ঘাড়

ঘুরে যাওয়া। তবে ভাইস-ভারসা নয়। অর্থাৎ আমার ঘাড় ঘুরে যাওয়া এবং ওদের হাসি নয়। ইলেকট্রনিক্স্-এর কণ্ট্রোল স্টেশন ওদের তরফেই।

কানে দুচারটে টুকরো কথাও ভেসে আসছিল। তার মধ্যে বাঙলার হয়ে প্রথম খেলেই কলার-তুলে-দেওয়া দুএকজন খেলোয়াড়ের নাম শোনা গেল। আর শোনা গেল এবারের ইংল্যাণ্ড অথবা নিউজিল্যাণ্ড যেখান থেকেই মহিলা ক্রিকেট টিম আসুক না কেন, দুজনার মধ্যে যে অপরূপ রূপবতী সে চান্স পেলেও পেয়ে যেতে পারে। মুশকিল হল, ওদের নাম জানতে পারলাম না। কারণ দুজনা থাকলে নাম উল্লেখ না করে দিব্যি খেলা যায়।

সহসা ইলেকট্রনিক্স্-এর কোনো গোলমাল হল কিনা জানি না। কারণ হাসির ফোয়ারা ছুটল অনেক দেরীতে—একটা ওভার বাউণ্ডারী হয়ে যাওয়া বল আকাশ থেকে সোজা নেমে এসে দুম্ করে আমার পিঠে পড়ার পর। আমি চকিতে একবার পেছনে তাকালাম তারপর সটান মাটিতে শুয়ে পড়লাম। ওদের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। একটা নীরবতা নেমে এলো লেক অঞ্চলে। কিন্তু আমার মনে হতে লাগল গাছের পাখীরা আরও উৎসাহে শিষ দিচ্ছে, গান গাইছে। লেকের জলে কোনো হাঁসের দল ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কিনা লক্ষ্য করি নি। ছাড়লে নিশ্চয়ই তারা কেলি করছে।

চোখের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে আসা দুটি মূর্তি দেখলাম। আমার আবার চোখ বন্ধ করলে পাতা পিট্‌পিট্ করে। তবু বন্ধ করেই থাকলাম। ওদের একজন ঝুঁকে পড়ল আমার মুখের ওপর।

অপরজন পাশে দাঁড়িয়ে বলে—নিশ্বাস পড়ছে?

আমি তাড়াতাড়ি নিশ্বাস বন্ধ করি।

আমার নাকের সংগে একটা আঙুল ঠেকে যায় সম্ভবত। ঘ্রাণ নিতে পারি না।

ভয়ে ভয়ে অপরজন বলে—না, নিশ্বাস পড়ছে না। কী হবে?

—অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। একটু দেখি। তারপরে ডাক্তার। দাঁড়া, হাত পা নাড়া-চাড়া করা ওর। অনেক সময় ঠিক হয়ে যায়।

ওরা দুজনা মিলে প্রাণপণে আমার দু হাত আর দু পা ভাঁজ করে আর খোলে।

একজন তারই মধ্যে বলে ওঠে—সুন্দর চেহারা, তাই না?

অন্যজন বলে—মন্দ নয়। খেলাধুলো করে মনে হয়।

মনে মনে ভাবি, ইস্কুলেই খেলাটা কেন ছেড়ে দিয়েছিলাম। আরও কিছুদিন টেনে-টুনে রাখলে হ'ত কলেজে।

বেশীক্ষণ দম আটকে রাখা যায় না। ফোঁস করে ছেড়ে দিই।

যে আমার হাত দুখানার ভার নিয়েছিল সে বলে ওঠে—নিশ্বাস ফেলেছে। শব্দ হল।

পা দুখানা ধরে ঠেলে ওপর দিকে উঠিয়ে অপরজন বলে—ঠিক বলছিস্ তো? শেষ নিশ্বাস নয়?

—না, দেখ্ না তুই। এই দেখ্। এক—দুই—এক—দুই।

হুঁ! বাঁচা গেল। বাব্বা।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসে চোখ দুটো কচলে নিয়ে ওদের বলি—কি হয়েছিল? আমি কোথায়?

সুন্দরী মেয়েটি বলে—আপনি লেকে। আপনার তো পিঠে একটা বল লেগেছিল।

—বল? ফুটবল?

—না, ক্রিকেট বল। কেন, আপনি দেখেন নি?

—আমি? হ্যাঁ, দেখব না কেন?

—তবে জানতে চাইছেন যে?

—ভাবছি, ওই বল আমার পিঠে না লেগে জলে পড়লে কি হত? তখন কি করতেন?

সুন্দরী মেয়েটি বলে—তখন একটা ব্যবস্থা করতাম। আপনি কেমন আছেন?

—আমার তো কিছু হয় নি।

—সেকি? অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তো।

—মোটেই না। বলে জোর ছিল নাকি? আল্‌তো ভাবে পিঠে পড়েছিল। ইস্কুলে ওর চেয়ে অনেক বেশী জোর হিট্ এই পিঠ সহ্য করেছে। অঙ্কের স্যার দীননাথ বাবুর হাত ছিল স্টীলের তৈরী।

—আপনি শুধু শুধু—

—আমি দেখছিলাম বাঙলার মেয়েরা কতটা উন্নতি করল।

ওরা দুজনা পরস্পরের মুখের দিকে চায়। সুন্দরী মেয়েটির মুখ একটুখানি হাসি-হাসি। অন্য জন স্পষ্টই বিরক্ত।

ওদের কোনো কিছু সিদ্ধান্তে আসার আগেই আমি বলি—চলুন। আমাকে বল করতে দেবেন? ইস্কুলে লেগ ব্রেক দিতাম।

বিরক্ত মেয়েটি বলে—কোনো প্রয়োজন নেই।

সুন্দরী মেয়েটি বলে—কেন? বল দিলে ক্ষতি কি। চলুন।

অপরজন নিম রাজী হলেও খুশী হন না। তবে ইতিমধ্যে আমি বুঝে ফেলেছি, আমার চেহারার সার্টিফিকেট সেই দিয়েছিল।

আমার মতো বোলার পেয়ে শেষ পর্যন্ত ওরা খুশীই হল। কারণ একটানা বল করে যাওয়া কোনো কথা নয়। আর আমার বল সত্যিই লেগের দিকে বাঁক নিচ্ছিল। বার কয়েক ওদের উইকেটের বেল ফেলে দিলাম। সুন্দরী ভেবে বসে সব বলই লেগ-ব্রেক দেব। তাই সোজা বলও সেই-ভাবে মোকাবিলা করতে গিয়ে ঠকে যায়। আসলে ইস্কুলে আমি যে পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম, এরা এখনো সেই পর্যায়ে এসে পৌঁছায় নি।

এতক্ষণে অল্প-সুন্দরী মেয়েটির মন জয় করি। সে বলে—আপনি সুন্দর বল করেন।

বিনয়ে বলি—এর নাম সুন্দর?

—হ্যাঁ। খুব ভালো বল করছেন।

—আপনাদের উপকার হয়েছে?

—যথেষ্ট। আমরা দু'জনাই ব্যাট করি। বল দেবার লোক পাই না। খুব

অসুবিধা হয়।

—আজ তো পেলেন। ভাগ্যিস অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

মেয়েটি হেসে ফেলে।

এবারে সুন্দরী এগিয়ে এসে ব্যাট মাটিতে ফেলে গ্লাব্‌স্‌ দুটো খুলে কোমরে হাত রেখে লাল টুকটুকে ঘাম-ঝরা মুখে বলে—একদিনে তো প্র্যাকটিস্‌ হয় না।

সময়ের অপব্যবহার না করে বলি—বলেন তো রোজই আমি আসতে পারি।

—কলেজ বন্ধ বুঝি?

—কলেজ? সে-সব কবে চুকিয়ে বসে আছি।

ওরা দুজনা একটু তির্যক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চায়। আমার পোষাকের দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয়।

তারপরে সুন্দরী বলে—বেশ তো আসুন না। ঠিক একটায় আসবেন। কেমন? অসুবিধা হবে?

—একটুও না। কিন্তু তার আগে আপনাদের পরিচয় জানা দরকার। আমারও পরিচয় আপনাদের জেনে নেওয়া উচিত।

সুন্দরী বলে—কী দরকার?

—বাঃ। রোজ খেলবেন অথচ অচেনা থেকে যাব।

—আচ্ছা বলুন আপনার নাম, আপনার নিবাস।

—আমার নাম দীপ্তেন বোস। নিবাস কসবা। আপনাদের?

সুন্দরী বলে—ওর নাম সুচরিতা সান্যাল। লেক ভিউ রোড, আর আমি—

সুচরিতা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে—এর একটি নামই রয়েছে। বিশ্ব বিখ্যাত বলতে পারেন।

—চুপ কর।

—না। ওঁর শুনে রাখা উচিত। শুনুন দীপ্তেন বাবু এ হচ্ছে জনক রোডের আলতাদি।

আমি মুখে তন্ময়তা ফুটিয়ে বলি—কী সার্থক নাম। অন্য কোনো নাম খাপ খাবে না। নামকরণ যে করেছে তার প্রতিভা আছে।
সুচরিতা একটু গম্ভীর হয়ে বলে— আমার নামটিও সার্থক জেনে রাখুন।
আলতাদি খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে।

ক্রিকেট বল পৃথিবীতে অনেক অঘটন ঘটিয়েছে। খেলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে সে সব কাহিনী লেখা রয়েছে। কিন্তু কসবার দীপ্তেন বসুর জীবন কাহিনী তো ইতিহাস হবার যোগ্য নয়। যদি যোগ্য হতো, তাহলে বলা যেতে পারে রক্তের অক্ষরে এ-কাহিনী লিখিত হওয়া উচিত।
জনক রোডের আলতাদির পরিচয় যদি শুধু ক্রিকেটে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে আমার কিছুই বলার ছিল না। কিন্তু ক্রিকেট হল তার জীবনের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অনেকটা ময়দানে গিয়ে ফুচ্‌কা খাওয়ার মতো। কাউকে এসপ্ল্যানেডের হকার্স কর্ণারের আশেপাশে দু একদিন ফুচ্‌কা খেতে দেখলে ভাবা উচিত নয় ওটাই তার জীবনের সব কিছু। আলতাদির বেলাতেও তাই। তবে তার ক্রিকেটের হুজুক আমাকে তার জীবন-পথের ল্যাম্পপোস্টের ধারে একটু জায়গা করে দিয়েছিল বলে আমি এখনো নিজেকে ধন্য মনে করি।
রোজ যেতে যেতে একদিন গিয়ে দেখি লেকের সেই অংশটি ফাঁকা। ওরা কেউ আসে নি। হাত ঘড়িটা কানের কাছে তুলে নিয়ে দেখি টিক্‌-টিক্‌ করছে। অর্থাৎ গতকাল রাত দেড়টার সময় বন্ধ হয়ে যায় নি। চুপচাপ বসে থাকলাম। লেকের মাঠের মতো আমার মনের ভেতরেও ফাঁকা হয়ে গেল। আর ঝোড়ো হাওয়ার মতো কী যেন হু হু করতে লাগল সেখানে। গাছের পাখীদের শিষ শুনতে পেলাম না।
আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উঠব উঠব করছি, এমন সময় দূরে সাদার্ণ এ্যাভেন্যুর ফুটপাথ ধরে একজন তরুণীকে শাড়ী পরে আসতে দেখলাম, অমন কতই তো আসা-যাওয়া করে। আলতাদিকে শাড়ী পরতে

দেখিনি। সে খেলোয়াড়ী সাজে আসে রোজ।

আশেপাশে দ্রষ্টব্য অন্য কিছু খুঁজে না পেয়ে সেই শাড়ী পরিহিতার দিকে চেয়ে রইলাম। চলনটা মন্দ নয়। মেয়েলী অথচ স্মার্ট। শাড়ীর রঙটি ফিকে নীল।

লেকের দিকে আর একটু এগিয়ে এলে চিনে ফেললাম। আলতাদি। নবরূপে আলতাদি। হৃদপিণ্ড আমার নির্দেশের অপেক্ষা না করেই দ্রুত রক্ত-চালনা শুরু করে দিল। পাখীদের গানের আওয়াজও কানে আসতে লাগল। মনের ভেতরে যে শীতল হাওয়া হু হু করছিল তা উষ্ণ হয়ে উঠল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম না। বসেই রইলাম। একটু অভিমান দেখাবার ইচ্ছা হল। যদিও জানি বাঙলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও অভিমান শব্দ-টির অস্তিত্ব নেই। ভারতের অন্য রাজ্যে থাকলেও পৃথিবীর অন্য দেশে নেই। তার মূল্যও কেউ দিতে জানে না। অভিমানের ইংরাজী প্রতিশব্দ অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়েও অভিধানে খুঁজে পাই নি। তবু আলতাদি শত হলেও বাঙালী মেয়ে। শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যের প্রভাব সোজাসুজি না হোক, রক্তের মধ্যে দিয়ে কিছুটা পেয়েছে।

সামনে এসে দাঁড়ায় আলতাদি। আমি কথা না বলে ভাষা ভাষা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকি। কিছুতেই কোনো নায়কের অভিনয় মনে করতে পারি না।

আলতাদি ওসব খেয়াল করল বলে মনে হল না। সে আমার সামনে বসে পড়ে। দু চারটে ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে বলে—সুচরিতা এলো না।

—সখ মিটে গেল?

—বুঝতে পারছি না। সে ভাবে কথাও বলল না।

—ভালই হল।

—কেন?

—রোজ আর খেটে খেটে বল করতে ইচ্ছে হয় না।

—আগে বললেই পারতেন।

—ভদ্রতা বোধ আছে কিনা ? মহিলারা অনুরোধ করলে প্রত্যাখ্যান করতে হয় ?

আলতাদি হেসে ওঠে।

—হাসলেন যে ?

—হাসির কথা বললেন কেন ?

—হাসির কথা ? আমি তো বুঝতে পারি নি। তাহলে বলতাম না।

—না বলে উপায় নেই। বল করতে আপনার ভীষণ ভালো লাগছে।

—থতমত খাই। মারাত্মক মেয়ে তো, কী বলতে চায় ? বলি—কেন ? ভালো লাগার কারণ কি ?

—আমরা খেলছি বলে।

—কি করে বুঝলেন আমার ভালো লাগছে ?

—বুঝতে হয় নাকি ? এটাই তো নিয়ম।

—তার মানে, আপনাদেরও ভালো লাগছে।

একটু চুপ করে থেকে আলতাদি বলে—যদি মনে করেন,তবে তাই।

—মনে করা করি নয়। সত্যি কিনা।

—মিথ্যে নয়।

—তাহলে আমিও স্বীকার করলাম।

আলতাদি হেসে উঠে বলে—আগে ভাগে সবকিছু স্বীকার করা অভ্যাস করুন।

—তাতে নিচু হতে হয়।

—ভীষণ সম্মানবোধ দেখছি।

একটু উত্তেজনা মিশিয়ে বলি—হবে না কেন ? গরীব হলে ওইটুকুও খোয়াতে হয় নাকি ?

আলতাদির মুখের হাসি একটু ম্লান দেখায়। বলে—আমি কি সেই প্রসঙ্গ একবারও তুলেছি ?

—না তুললেও বোঝা যায়। আমার পোষাক-পরিচ্ছদে কি আমার অবস্থার কথা লেখা নেই ? আমার চেহারা সুন্দর হলেও ভাইটামিন

আর প্রোটিনের অভাবে স্বাস্থ্যকর ফিনিশিং নেই। আপনি এসব বুঝতে পারেন। সব কিছু পাশ করে লেকের ধারে বসে থাকি বেকার বলে। একথা বুঝতে কমিশন বসাবার দরকার হয় না।

—অত রেগে যাবার কি আছে? আমি আপনার সঙ্গে সেধে দেখা করতে এসেছি বুঝছেন না? সুচরিতা এলো না। আপনি অপেক্ষা করে ফিরে যাবেন বলে এসেছি।

—আপনি কি ভাবছেন আমি রাগ করেছি? তাহলে কিছুই চেনেন নি পৃথিবীটাকে। আমার আনন্দ হয়েছে।

—এবারে চলি তাহলে।

—কেন? আমি আপনাকে তাড়িয়ে দিই নি।

—আপনার বাড়ি হলে সে প্রশ্ন উঠত।

—একটু উস্‌খুস করে বলি—এবারে অকপটেই স্বীকার করছি আপনি চলে গেলে মন খারাপ হয়ে যাবে।

—আমার বদলে সুচরিতা হলেও মন খারাপ হত।

—কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন। এ অন্যায়।

—তাই নাকি?

—বাঃ, আপনি দেখতে কত সুন্দর জানেন না বুঝি?

—সুন্দর হলেই ভালো হয়ে যায়?

—না তো কি? রাজ্যসুদ্ধ লোক জানে এ-কথা। নতুন কিছু নয়। আলতাদি হেসে ওঠে।

এইভাবে ক্রিকেট খেলার সময় ব্যাট-বলে বিরুদ্ধতার মধ্যেও যেমন একটা অবিচ্ছেদ্যতা গড়ে ওঠে, আলতাদির সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতা তেমনি বেড়ে উঠল। তবু মনে আমার সব সময় সংশয়, আমার মতো এক অতি সাধারণ তরুণকে সে এত আস্কারা দিচ্ছে কেন? তার কথাবার্তা, চালচলন পোষাক-আশাক—সব কিছুর মধ্যে ফুটে ওঠে স্বচ্ছল পরি-

বারের ছাপ। তার মতো রূপবতী গরীবের ঘরে জন্ম নিলেও বিত্তবান এবং বিদ্বান পাত্র কিংবা প্রেমিকের অভাব হয় না। অথচ সে প্রায়ই আমাকে সঙ্গ দেয়। অত্যন্ত খোলাখুলি কথা বলে সে। তবে কথার মধ্যে কোনোরকম ভাবাবেগ বা চিত্তদৌর্বল্য নেই।

এতদিনে আলতাদির সংসারের কথা মোটামুটি জেনে গিয়েছি। সে একমাত্র কন্যা। মা জীবিত নেই। বাবা অলকেশ রায় একটি প্রাইভেট কম্পানীতে উঁচু পোস্টে কাজ করেন। তবে জনক রোডের বাড়িটা নিজস্ব নয়—ভাড়া।

আলতাদি লরেটো থেকে পাশ করা মেয়ে। কথাটা প্রথম শুনে অবাক হয়েছিলাম। কারণ তার মুখে অবিরাম ইংরাজী বুলি শুনি নি কখনো। তবে লরেটোর পরে কতদূর পড়াশোনা করেছে বলতে চায় না কিছুতে। শুধু হাসে। আর হাসে বয়সের কথা জানতে চাইলে। বলে, মেয়েদের বয়স যেমন দেখায় ঠিক তেমনি। কুড়িতে বুড়ী যারা, তারা সত্যিই বুড়ী। আর চল্লিশেও যাদের উদ্ভিন্ন যৌবনা বলে মনে হয়, তারা তাই। মেয়েদের আবার বয়স আছে নাকি? বছরের হিসাবে তাদের বয়স হয় না।

তবু আমি নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে। আলতাদি তখন মৃদু ধমক দিয়ে বলে—দেখো দীপ্তেন, আজকাল কিছু জনপ্রিয় উপন্যাসে নায়িকা নায়কের চেয়ে বড় না ছোট এই নিয়ে কুহেলিকার সৃষ্টি করা হয়। ওটা উপন্যাসের ফ্যাসান। পাঠক পাঠিকাদের বেশ একটা কৌতূহলের মধ্যে রেখে দেবার সস্তা প্যাঁচ। বাস্তবে ওসব চলে না। তাছাড়া এখানে কোনো নায়ক নায়িকার প্রশ্ন জড়িয়ে নেই। সুতরাং একথা আর নয়।

আমি ঢোঁক গিলে টুপ করে ছাড়ি—নেই কে বলল? আলতাদি এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকে। তার সোজা দৃষ্টি আমার চোখের ওপর। ভাবলাম এইবারে কাট-অফ। আমার অবস্থার কথা তুলে আমার দুঃসাহসিকতাকে বিদ্রূপ করবে। কিন্তু না। তার দৃষ্টি শান্ত এবং গভীর।

সেই দৃষ্টিতে বিরক্তি নেই—বিস্ময় রয়েছে।

আমার চোখের পাতা পড়ে। বলে উঠি—ওভাবে ঠায় চেয়ে থাকলে কেউ তাকিয়ে থাকতে পারে নাকি ? পৃথিবীতে কেউ কখনো পারে নি—সাধু মহাপুরুষ ছাড়া।

—না পারা অপরাধ। ইয়ং ম্যানরা লজ্জায় মাথা নোয়ায় না।

—কি করে বুঝব আমি ইয়ং ?

—বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে ? কাল থেকে আমি তো আর আসছি না, তখন দেখো বুঝতে পার কিনা।

খপ করে আলতাদির হাত জীবনে প্রথম চেপে ধরি। ভেবেছিলাম মাফ চাইব। কিন্তু মাখনের মতো নরম হাত অনুভব করে কথা বলতে ভুলে গেলাম।

একটু পরে বলি—তুমি এত ব্যাট কর, হাত নরম কেন ?

—বিধাতাকে প্রশ্ন কর। তোমার হাত এত কেঠো কেন ?

—বাঃ, হবে না? বাড়ির সামনে কোদাল চালিয়ে ঢ্যাঁড়শের চাষ করি। আমার খুব পছন্দ। ইংরাজীতে লেডিজ ফিংগার বলে কিনা ?

আলতাদি নিজে থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—কাল আসছি না কিন্তু। এনগেজমেন্ট রয়েছে আগে থেকে।

—আসল এনগেজমেন্ট ?

—তার মানে।

—মানে এনগেজড হওয়া। সেই আংটি দেওয়া নেওয়া।

—খুব রসিকতা জানো দেখছি। মুখখানা তো বোকা বোকা।

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলি—সত্যি ? সত্যি বলছ ?

—এতে খুশী হওয়ার কি হল ? বোকা হওয়া ভালো ?

—আলবাৎ। একটা বই-এ পড়েছিলাম বোকা বোকা ছেলেদের মেয়েরা খুব পছন্দ করে।

আলতাদি এবারে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে। আর আমি সেই হাসির রূপ দেখি। এমনিতেই আলতাদি অপূর্ব। হাসলে তার গালের টোল

উর্বশীর কথা মনে করিয়ে দেয়। অথচ উর্বশীকে কেউ দেখে নি। এ বোধ হয় সংস্কার। সব চেয়ে রূপসী হলেই উর্বশী, এতি দেবী রয়েছেন। তাঁরা সবাই সুন্দরী। অথচ কেউ তাঁদের নাম করে না। লেখেও না কেউ। তাঁদের সৌন্দর্য পূজারীর দৃষ্টিভঙ্গী আর মনোভাব নিয়ে দেখতে হবে বলে, সবাই এড়িয়ে চলে। সাহস পায় না—কি লিখতে কি লিখে ফ্যাসাদে পড়বে। তাঁদের রূপের সঙ্গে যে সমস্ত নারীর তুলনা করা হয় তাঁরাও সম্মানিত অথবা পরম স্নেহ ভাজন। তাই বোধহয় আলতাদির রূপ দেখে লক্ষ্মী সরস্বতীর কথা মনে পড়ে না একবারও। যদিও কুমোরটুলীর মূর্তি দেখে তাঁদের সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে। উর্বশীর মূর্তি না দেখেও সেই কথাই মনে হয়।

—চেয়ে চেয়ে এত দেখছ কি দীপ্তেন?

—আলতাদিকে।

—শেষ হয় নি?

—অসীমের শেষ আছে?

—আজকাল কবিত্ব হয় নাকি?

—দেখছি তাই, ওসব পছন্দ করতাম না বলে বিজ্ঞান নিয়েছিলাম কলেজে। কিন্তু একটা কথা বারবার তুমি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছ।

—কোন্ কথা?

—বাড়িতে নিয়ে যাবে বলেছিলে।

—যাব।

—কবে?

—পরশু।

—কাল তোমার এনগেজমেন্ট রয়েছে। আজ?

—সুবিধে হবে না।

—তোমার বাবাকে এড়িয়ে যেতে চাও?

আলতাদির হাসিতে এবার কিসের যেন ছায়া পড়ে। সে বলে—না। বাবাকে লুকোবো কেন? বাবা সেই ধরনের নন। আমাদের বাড়িতে

অনেকেই যায়।
—তারা অনেক উঁচুদরের আলতাদি। আমার মতো নয়।
—দেখো দীপ্তেন, এসব কথা আমার মাথায় আসে না। তুমি এ-বিষয়ে কেন বল ? পরশু যেও। ঠিকানা তো জান। বিকেলের দিকে যেও। আমি অপেক্ষা করব।
—ভেবেছিলাম আজকে যাব। ভালো জামাকাপড় পরে এসেছিলাম। আলতাদি আবার হাসে। বলে—খারাপ জামাকাপড় পরে যেও। আজ যেতে পারতে। কিন্তু আজ আমার কলাভবনে একটা নাটক আছে।
—তুমি অভিনয়ও কর ?
—ওরা ছাড়ে না। মন্দ লাগে না॥ তবে নেশা নেই।
—ইস্, আমি অভিনয় জানলে খুব ভালো হত।
—শিখে নাও।
—নাঃ, ওসব আসে না।
—তাহলে দুঃখ করে আর কি হবে ?

দোতলার ফ্ল্যাট। আলতাদির বাবার নেম-প্লেট। পাশে কলিং বেলের বোতাম। নিশ্চিন্তে বুড়ো আঙুলের চাপ দিলাম। দিনক্ষণ দেখে আলতাদি আমাকে আসতে বলেছে। সঙ্কুচিত বা আশঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।
কিন্তু দরজা খোলে না কেউ। দু তিন মিনিট কেটে গেল। আলতাদি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে নাকি ? আর একবার টিপে ধরি বোতাম।
ভেতরে যথারীতি পদশব্দ। তারপর হঠাৎ দরজা খুলে যায়। সামনে আলতাদি। আবার চিন্তাগ্রস্ত মুখে হাসি ফোটে।
আলতাদির মুখে হাসি নেই কেন ? সে তাড়াতাড়ি বলে—দীপ্তেন এসেছ ? একটু দাঁড়াবে ? আমি পাঁচমিনিটে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি। আলতাদির মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। চোখদুটো ফোলা ফোলা।

ঘুমিয়ে কিংবা কেঁদে অমন হয়েছে। মনে হয় কেঁদেই হয়েছে। আলতাদিও তবে কাঁদে? তার জীবনে দুঃখ আছে? আমি যে হাসি খেতে এসেছি। অপ্রস্তুত হয়ে বলি—কোথাও যাবার কথা ছিল না তো?

—ও তাই তো। তাহলে? কি করি?

আলতাদিকে দেখে কষ্ট হয়। আমার জন্যে যে কোনো কারণেই হোক বেচারা খুবই বিপাকে পড়েছে। ওর বাবা বোধহয় অফিসে যান নি। বোধহয় খুব কড়া প্রকৃতির মানুষ। এ সব পছন্দ করেন না। অথচ আলতাদি সেকথা আমাকে বলতে চায় না।

তাড়াতাড়ি বলি—আমি বরং লেকে গিয়ে বসি। তুমি পারলে এসো। আমি আধঘণ্টা অপেক্ষা করব তোমার জন্যে। অসুবিধা হলে আসতে হবে না।

—না না। আমি যাব। তাই ভালো।

ভেতর থেকে মহিলা কণ্ঠের বেশ একটা কৃত্রিম আওয়াজ ভেসে আসে,

—কার সঙ্গে কথা বলছ নীলা? বয় ফ্রেণ্ড?

আলতাদির আর একটা নামও আছে তবে। নীলা। কেমন বেখাপ্পা শোনায়। অত মিষ্টি নয়।

আলতাদি কেঁপে উঠে বলে—একজন ভদ্রলোক মিসেস্ ত্রিবেদী।

খন্‌খনে হাসির সঙ্গে জবাব আসে—ভদ্রলোক তো বটেই। ভেতরে এনে বসাও। বাইরে ওভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? আমাকেও দেখতে দাও।

—উনি বসতে চাইছেন না।

ভদ্রমহিলা আলতাদিকে সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান। আমার মাথা ঘুরে যায় দেখে। কী সাজের বহর। আলতাদি বলে মেয়েদের বয়স বছরের হিসাবে পড়ে না। তা যদি হয়, তবে মহিলার বয়স তিরিশ। হাতের নখ, ঠোঁট, ভ্রূ, চোখের কোনা—সব কিছুতেই রূপ চর্চার উদগ্র ছাপ।

তিনি আমায় দেখে ঠোঁট বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন। তারপর

হাসতে থাকেন। শেষে আলতাদিকে বলেন—অনেক ঘষা-মাজা করতে হবে নীলা। নট্ এ ৺ড় চয়েস্। তাছাড়া তুমি জান, এত ফালতু পয়সা তোমার বাবার নেই।

আলতাদির মুখের রক্ত কোথায় মিলিয়ে যায়। মোনালিসার মুখের হাসি মিলিয়ে গেলে কেমন দেখতে হয়? কল্পনা করি নি কখনো। তবে কোনো ভাস্কর যদি শ্বেতপাথরে খোদাই করে মোনালিসার রূপ দেন আর সেই মোনালিসার মুখে হাসি ছাড়া আর সবই থাকে তবে এই মুহূর্তের আলতাদির মতো দেখতে হবে।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—আজ্ঞে চলি আলতাদি।

—হোয়াট্? আল্টাডি? মারভেলাস। এতেই বুঝি নীলা ভুলেছে?

আমি পেছন ফিরে পা বাড়াতেই আলতাদি ডাকে—দীপ্তেন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলি—বল।

—যেতে হবে না। এসো। বসবে এসো।

আমি আলতাদির মুখে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা লক্ষ্য করি। বুঝতে পারি এক-ধরনের সংগ্রামের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হয়েছে সে।

আলতাদির পেছনে একটা ঘরে গিয়ে দাঁড়াই। বসবার ঘর। বেশ বড়। আলতাদি বলে—বসো। আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।

প্রতিবাদ করলাম না। আলতাদির কাজে বাধা দিলে তাকে সাহায্য করা হবে না। তার সব কিছুতে সায় দিলে মদত দেওয়া হবে।

সাজানো-গোছানো ড্রইং রুম। রুচিসম্পন্ন। শিল্পীর হাতে আঁকা দুখানি মৌলিক ছবিও ঝুলছে। নিশ্চয় উঁচুদরের। নইলে ঝুলবে কেন? আমি ওসব বুঝি না। যে ছবি চোখে দেখে বোঝা যায় না, আর যে কবিতা পাঠ করে অর্থোদ্ধার করা যায় না আমি তার গুণগ্রাহী নই। নিজের মনকে অতটা পরিশীলিত করার সুযোগ পাই নি। শুনেছি রাগ-সঙ্গীতের মতো এই সব কবিতা পাঠেরও হাতে খড়ি আছে।

ছবি দুটো যেন আলতাদি। আভাষ পাওয়া যায়। ধরা যায় না। এই সব শিল্প দেখলে ফরাসী দেশের সেই শিল্পীর ছবির কথা মনে পড়ে।

গল্প কিনা জানি না। ভদ্রলোকের বাজারে খুব নাম অতি আধুনিব হিসাবে। তাঁর একটি বিশাল পেন্টিং দেখে সবাই গদগদ। নীল রঙের পটভূমিকায় ছিটে ফোঁটা অজস্র দাগ। ...২ অর্থবহ। সবাই নিজের মনে সেই অর্থ আবিষ্কার করে তন্ময় ও কৃতার্থ। শেষে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর "সোনার তরী" কবিতার অর্থ সম্বন্ধে যেমন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাঁকেও তেমনি প্রশ্ন করা হল। তিনি বললেন যে ক্যানভাসে নীল রং মাখিয়ে নিজের গাড়ির সামনে বেঁধে বৃষ্টির মধ্যে দু চার মাইল জোরে ড্রাইভ করে এই অবস্থা হয়েছে। বৃষ্টি পড়ছিল খুব ছিটে ফোঁটা।

মিসেস ত্রিবেদী বলে ওঠেন—এটিকেট্ শেখো নি বাপু? একজন লেডি দাঁড়িয়ে আছে দেখছ না? কথা বলছ না কেন?

—আমি ভাবছিলাম আপনি কথা বলবেন। আমি শুরু করলে খারাপ হবে কিনা ঠিক করতে পারছিলাম না।

—দ্যাট্স্ টু ব্যাড। কতদিনের পরিচয় নীলার সঙ্গে?

—বেশীদিন নয়।

—কি করা হয়?

—কিছুই না।

—লেখাপড়া।

—সামান্য। আপনাদের নীলা কি এখনো মাইনর?

—মাইনর মানে?

—নাবালিকা।

—কেন? রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতে চাও?

—না না, ম্যারেজ ফ্যারেজের কথা ভাবিও নি। ওটা আপনার মাথায় ঢুকলো কি করে জানি না।

—তবে? এমনি কৌতূহল?

—সেকথা বলতে পারেন।

—তুমি কি ওকে শুধু একটু দর্শনের জন্যে এসেছ।

—হ্যাঁ। আর একটু কথাবার্তা।

—ও নাবালিকা হলে তোমার মুশকিল, তাই না?

—না। আমার একটুও মুশকিল নয়। ও নাবালিকা হলে আমার মনে যে প্রশ্ন উঠেছে তার খোলসা হয়ে যাবে।

—কি রকম?

—নাবালিকাদের গভরনেস থাকে জানি। আপনি বুঝি ওর ছেলেবেলা থেকেই রয়ে গিয়েছেন?

আমার কথা শেষ হতেই মিসেস ত্রিবেদী হাত-পা ছুঁড়ে অদ্ভুত আচরণ শুরু করেন। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাই। তিনি হিন্দি আর ইংরাজীতে অকথ্য গালাগালি দিয়ে চলেন। হিন্দি খিস্তিগুলো ভালই বুঝলাম, এমনকি ইংরাজী খিস্তিগুলোও কিছু কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমার ভীষণ ভয় হয়। একসময়ে ভাবি চেয়ার ছেড়ে উঠে পালাবো। একটা কিছু গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছি নিজের অজ্ঞাতে। পাড়ার ছেলেদের ডেকে আবার ধোলাই দেবার ব্যবস্থা না করেন। পরে ভরসা হয়, আলতাদি আমাকে বাঁচাবে। সে পাড়ারও আলতাদি।

মিসেস ত্রিবেদী আমার সামনে ঝুঁকে পড়ে গলার শিরা ফুলিয়ে রক্তাক্ত চোখে বলেন—হ্যাভ য়্যু এভার হার্ড দা নেম অব্ দা গ্রেট ফিজিসিয়ান ডক্টর ত্রিভেডী? দা রিনাউন্‌ড্ হার্ট স্পেশালিষ্ট?

আমি তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে বলি—নিশ্চয়ই চিনি। তিনি বিরাট ডাক্তার ছিলেন। আমার বাবার কার্ডিওলজি তাঁর চেম্বারে করা হয়েছিল। লর্ড সিন্‌হা রোডে। চৌষট্টি টাকা ফি। অল্প বয়সে হঠাৎ মারা গেলেন। কাগজে ছবি বার হলো। দেড় বছর হয়ে গেল।

—আই আম্ হিজ উইডোড ওয়াইফ।

সোফা ছেড়ে উঠে হাত জোড় করে বলি—আমি অন্যায় করে ফেলেছি। খুবই লজ্জিত। আমাকে ক্ষমা করবেন।

—চেহারা আর পোষাকের ছিরি দেখেই বুঝেছিলাম কেমন ব্যবহার তুমি করবে।

ভদ্রমহিলা গট্‌গট্ করে একটা করিডরের পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে আলতা দি একটা ধূমায়িত কাপ হাতে এগিয়ে এলো।
আমি তড়বড় করে বলি,—একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে ফেলেছি আলতাদি। তুমি শুনলে রেগে যাবে।
—আমি শুনেছি। চা খাও।
—আমিও তাই ভাবছিলাম। ওঁর চেঁচামেচি তোমার কানে না যাবার কথা নয়। এলে না কেন তবে?
—তুমি তো অবলা নও। আত্মরক্ষা করতে পারবে জানতাম।
—এর নাম আত্মরক্ষা?
আলতাদি আর কিছু বলে না। আমি লক্ষ্য করলাম, তার মুখে হাসি নেই। এমন আলতাদিকে আমি দেখি নি। মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, না এলেই ভালো হত। আমার ধারণা ছিল দুঃখ কাকে বলে আলতাদি জানেন না। এখন দেখছি দুঃখ তারও আছে এবং যথেষ্ট গভীর।
চা খাওয়া শেষ করলাম। মিসেস ত্রিবেদীর কথা একবার তুলব ভাবলাম। তারপর নিজেই চেপে গেলাম। যদিও মিসেস ত্রিবেদীর খবরদারি এই বাড়িতে আমার অস্বাভাবিক লাগছিল। পরে ভাবলাম, আলতাদি বোধহয় বিস্তারিত ভাবে তার বাড়ির কথা বলে নি আমাকে। কেনই বা বলবে?
উঠে দাঁড়িয়ে বলি—আজ আমি চলি আলতাদি।
—না।
—কিন্তু—
—তোমার সঙ্গে কথা আছে দীপেন। বাবা একটু পরেই বাইরে যাবেন। তখন বসে বলা যাবে।
—তোমার বাবা বাড়িতে আছেন?
—আজ তাঁর ছুটি।
—তবু তুমি আমাকে আসতে বলেছিলে?
—তিনি থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। আমি ভাবতে পারি নি মিসেস

ত্রিবেদী আজ আসবেন।

—উনি কে?

—বলব। এখন একটু স্বাভাবিক কথা বলতো।

—ইচ্ছে হচ্ছে না। তোমার মুখে হাসি না দেখলে ভালো লাগে না।

—চেষ্টা করে দেখ, হাসি ফোটাতে পারে কিনা।

—পারব না। হাসি ফোটাতে হলে হাসি মিলিয়ে যাবার কারণ জানা চাই। সেইটিকে নির্মূল করতে হবে তো?

—তবে থাক এখন। তোমার চাকরির কতদূর হল?

—হলো না। আমি অন্য চেষ্টা করছি আলতাদি। ভাবছি ব্যবসা করব।

—টাকা?

—আমার এক বন্ধুর বাবা ব্যাংকের এজেন্ট। কিভাবে ধার পাওয়া যায় তিনি জানেন। চেষ্টা করবেন বলেছেন। আমি একটা কারখানা খুলব।

আলতাদি উৎসাহিত হয়ে ওঠে—কারখানা? ফ্যাক্টরি খুলবে। তাই নাকি? তুমি পারবে?

—পারব না কেন? আমি বুঝি শুধু লেগ-ব্রেকই দিতে জানি?

এতক্ষণে আলতাদির মুখে আলতো হাসি ফুটে ওঠে। তাই দেখে অনুপ্রেরিত হয়ে বলি—গুগ্‌লি ছাড়তেও আমি ওস্তাদ, তুমি ভাবতে, লেকের ধারে বসে বসে শুধু রোদ পোহাই। মোটেই তা নয়। রোজ সকাল নটার সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে খেয়ে দেয়ে বার হয়ে পড়ি। নানান্ জায়গায় ঘোরাফেরা করি। লেকের সময়টা হল বড় সাহেবদের লাঞ্চ-আওয়ার। আমিও বিশ্রাম করি। ট্রামের পাশ আছে।

ইতিমধ্যে আলতাদির মুখের হাসি আবার মিলিয়ে যায়। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার মন অন্য কোথাও পড়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে মিসেস ত্রিবেদী যেদিকে গিয়েছেন সেদিকে ফিরে দেখে।

একটু পরে শব্দ হয়। মিসেস ত্রিবেদীর কথা শোনা যায়। আমি ভাবি

বাড়িতে আর কে আছে ? আলতাদির বাবা বোধহয় বিশ্রাম করছিল। মিসেস ত্রিবেদী এগিয়ে আসেন। পেছনে আর এক ভদ্রলোক। খুব সুপুরুষ।

আলতাদি বলে ওঠে—বাবা, এঁর কথা তোমাকে একদিন বলেছিলাম। মনে নেই ?

আমি হতভম্ব হই। ভদ্রলোককে আলতাদির বাবা বলে মোটেই বিশ্বাস হয় না। অত বয়সই নয়। আলতাদির বয়স কত জানি না। যত কমই হোক তার বাবার বয়স অন্তত পঁয়তাল্লিশ হওয়া উচিত কম করে। দেখলে মনে হয় ত্রিশের কোঠায়।

অলকেশ রায় হেসে আমার দিকে এগিয়ে আসেন। কাছে দাঁড়ান। বলেন—ক'বার আউট করেছ নীলাকে ?

কিছু বলতে পারি না। মুখে কথা যোগায় না। অল্প একটু হাসি। উনি নিজেও যেন আমার কাছ থেকে কোনো জবাবের প্রত্যাশা করেন নি। তবে আচরণের মধ্যে স্নেহভাব রয়েছে।

বলেন—গল্প কর দুজনে। আমি আর একদিন আলাপ করব।

মিসেস ত্রিবেদী কি একটা বলতেগিয়েও থেমে যান। অলকেশ বাবুকে চোখের ইশারায় ডাকেন। অলকেশ বাবু আর কিছু না বলে বার হয়ে যান।

চেয়ে দেখি আলতাদির মুখখানা বিষাদময়।

আমি বলি—আলতাদি, তোমার বাবার মতো বাবা পেতে হলে ভাগ্য দরকার।

—কেন ? সুন্দর চেহারা বলে ?

—না। উনি তোমাকে এত ভালবাসেন যে তোমার পরিচিত বলে আমার ওপরও একটু খানি স্নেহ ঝরে পড়ল। এমন দেখা যায় না বড় একটা। আলতাদির চোখ দুটো টলটল করে উঠল। তারপর মুক্তোর চেয়েও দামী দু ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল কার্পেটের ওপর।

আমি কি করব স্থির করতে পারি না। কেউ সামনের ব্যালকনি থেকে

আমাকে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তে বললে অনায়াসে পারতাম। তাতে যদি আলতাদি শান্তি পেত। কিন্তু আমার মুখে কথা ফুটল না।

আরও বেশ কিছুক্ষণ অশান্তি ভোগ করলাম। আলতাদির মুখে কথা নেই। তারপর সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমাকে বলল—তোমাকে আমি সব কিছু বলব বলে বসতে বলেছি। একজনকে অন্তত বলি। নইলে পারছি না।

আলতাদি যা বলল, তাতে আমি কতটা দুঃখ পেয়েছিলাম বলে বোঝাতে পারব না। আমার নিজের অসাম্যতা আমাকে নিদারুণ ভাবে পীড়া দিয়েছিল। কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে এক বিরাট বিস্ময় আমাকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল।

অল্প বয়সে আলতাদির মা মারা যান। অলকেশবাবুর বয়স তখন খুব বেশী হলে ত্রিশ। আর বিয়ে করেন নি। অলকেশবাবুর মা তখন বেঁচে ছিলেন। আত্মীয় অনাত্মীয়রা তাঁকে ছেঁকে ধরেছিল ছেলের বিয়ে দেবার জন্য। ঠাকুমা সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলের যেখানে অনিচ্ছা সেখানে অনুরোধের ঢেঁকি গেলা সম্ভব নয়। আসলে তিনিও আলতাদির মাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন গভীর ভাবে। তাই অন্য একজন এসে সেই জায়গাটি দখল করে নেবে, মন থেকে তিনি কিছুতেই মানতে পারেন নি। অলকেশবাবুর অনিচ্ছা তাঁকে পরম স্বস্তি দিয়েছিল।

সুখের সংসার। মায়ের অভাব আলতাদি অনুভব করতে পারে নি, বাবা আর ঠাকুমার জন্যে। কিন্তু সম্প্রতি এই সংসারে শনির দৃষ্টি পড়েছে। ঠাকুমা বেঁচে থাকলে এমন সম্ভব হত না। ডাঃ ত্রিবেদী মারা গেলেন হঠাৎ। তিনি তখন খ্যাতির শীর্ষে। তাঁর সঙ্গে অলকেশবাবুর হৃদ্যতা বহু দিনের। যাতায়াতও ছিল। কিন্তু কেউ জানত না মিসেস ত্রিবেদীর বাইরের পালিশের অন্তরালে একটি ভোগলিপ্সু পিশাচী লুকানো ছিল। তিনি বরাবরই অলকেশবাবুর সঙ্গে একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতেন। লোকে এটাকে স্বাভাবিক ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু আলতাদির ভালো লাগত না। সে লক্ষ্য করত মিসেস ত্রিবেদীর কাছে তার বাবার

ব্যক্তিত্ব কেমন যেন মিইয়ে যেত। তবু সে তেমন কিছু ভাবে নি। বাবাকে সে ভালোরকম চিনত।

কিন্তু ডাঃ ত্রিবেদীর মৃত্যুর পর তার বাবাকে জড়িয়ে মিসেস ত্রিবেদী সম্বন্ধে কথাবার্তা তার কানে আসতে শুরু করল নানান অনুষ্ঠানে, ক্লাবে। সে কয়েকবার তার বাবাকে জানিয়েছে যে মিসেস ত্রিবেদীকে তার মোটেই ভালো লাগে না। প্রতিবারই তার বাবা কেমন যেন চমকে উঠেছেন—মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে।

তারপর একদিন আলতাদি বুঝতে পারল তার বাবা ডাইনী-মন্ত্রে সম্পূর্ণ বশীভূত। আর তখন থেকে মিসেস ত্রিবেদী জনক রোডে আসতে শুরু করে। তার বাবা প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারেন না।

আলতাদির আশংকা তার বাবাকে আর বেশীদিন এ-বাড়িতে ধরে রাখা যাবে না। মিসেস ত্রিবেদী তাঁকে ঠিক ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে তুলবে। এতে তার বাবা মনে মনে মোটেই খুশী হবেন না। তবু অসহায়ের মতো তিনি মিসেস ত্রিবেদীর ইচ্ছা মতো চলবেন।

এত কথা আলতাদি একবারে বলেনি। অনেক থেমে, অনেক কষ্টে, একটু একটু করে বলেছিল। বলার সময় সে বারবার আমার মুখের দিকে চেয়ে কী যেন দেখছিল। যখন সব বলা শেষ হল তখন ঘরের ভেতরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আশেপাশের বাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসছিল।

আমি নীরব। কোনো উপন্যাসের অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনার মতো স্তম্ভিত। এমন যে ঘটে,জানতাম না। অনেক বাবা-মায়ের কথা শুনেছি যাদের চরিত্র বলে কোনো পদার্থ নেই। আরও অনেক কিছু শুনেছি, কিন্তু অলকেশ রায়ের মতো একজন সজ্জন ব্যক্তি কাঁচ-পোকার দুর্নিবার আকর্ষণে পড়ার মতো নিজেকে উৎসর্গ করে দেবেন, এ যেন ভাবা যায় না। সম্পূর্ণ নতুন কিছু।

একটা কিছু বলতে হয় বলেই বললাম—তুমি কোনোরকম চেষ্টা কর নি আলতাদি ?

—কী চেষ্টা করব ? মেয়ে হয়ে কী চেষ্টা করতে পারি ?

—তুমি যে সব বুঝতে পার, তোমার বাবা জানেন না ?

—জানেন। আমার ভবিষ্যৎ কথা বলতে আজকাল তিনি সঙ্কোচবোধ করেন। শোন দীপ্তেন, আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তুমি ব্যবস্থা করতে পারবে ?

—আমি ? তুমি বলে দাও, কোন্ ধরনের ব্যবস্থার কথা বলতে চাইছ।

—যে কোনো রকম। এই কথাটা আমি কাউকে বলতে চেয়েছিলাম। তোমাকে প্রথম বললাম।

—তোমার আর কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই ? কিংবা আত্মীয় ?

—আত্মীয় যাঁরা আছেন, তাঁরা দূর সম্পর্কের। বাবা ও মা দুজনাই একমাত্র সন্তান। আর বন্ধু! ছেলে বন্ধুর কথা বলতে চাইছ বোধহয়। না, তেমন কেউ নেই। আসে অনেকে। কেন আসে, তাও বলে দিতে হবে না তোমাদের। ওদের কেউ কেউ তরলমতি, আবার কেউ অত্যন্ত উদ্দেশ্য-পরায়ণ। তারা ক্ষতিই করবে।

—তাদের মধ্যে এমন একজন অন্তত থাকতে পারে, যে চিরকাল তোমার ভার নিতে রাজী হবে।

—নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু আমার রুচিতে বাধে। তারা অন্য রকম। আমাকে একবার দখলে পেলে আমার মনকে পা দিয়ে তারা পিষে ফেলবে।

আলতাদির জন্যে একটা কিছু করতে আমি ছট্‌ফট্ করি। কিন্তু আমার যে এক ফোঁটা ক্ষমতাও নেই। নিজেই বেকার। প্রতিষ্ঠা বলে কিছু নেই। দৃষ্টিতে বোধহয় বেশী রকম হতাশা ফুটে উঠেছিল। আলতাদি একটু হেসে বলে—তুমি এখনই ব্যস্ত হয়ো না। পরে ভেবে দেখো।

—তোমার বাবা চলে গেলেও পথে বসিয়ে যাবেন না তোমাকে। একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন।

—জানি। তবে আমি তা চাই না।

সেদিন এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে আমি জনকরোড ছাড়লাম। ক্রিকেটের

বল বাইরে থেকে চকচকে দেখায়, কিন্তু কত বোলারের হৃদয় যে সে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে কেউ খবর রাখে না। ক্রিকেটের ইতিহাস শুধু তার উজ্জ্বল দিকটাই সবার সামনে বেশী করে তুলে ধরে। কিন্তু কত খেলোয়াড়ের নিভৃত মনের অকথিত বেদনা এর পেছনে সঞ্চিত রয়েছে, কত ব্যর্থতার অশ্রুজল যে এর মূলে রস সঞ্চার করে একে সজীব করে তুলেছে এবং আজও তুলছে সেই সব কাহিনী কে লিখতে চায় ? ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত কত অনন্য প্রতিভাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দিয়েছে —সেই সব কথা ইতিহাসের পাতায় স্থান দেওয়ার হয়ত মূঢ়তা। আত্ম-জীবনী লেখায় যা প্রধান গুণ, ইতিহাস রচনায় তার গুরুত্ব বোধহয় তত নেই।

এতদিন আলতাদির প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদের আকর্ষণের মতো। মনের কাছাকাছি আসা যায় না। অথচ মনের চারদিকে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে মাথা কুটে মরতে হয়। পৃথিবী সব সময় চাঁদকে টানে অথচ কাছে আসতে দেয় না। স্পর্শ করতে দেয় না। ঠিক তেমনি। সেদিন জনক রোড থেকে ফিরে আসার পর সহসা আমি আলতাদির মনের একেবারে কাছাকাছি চলে এলাম। এতদিন আলতাদি ছিল রূপকথার রাজকন্যা, এখন সে হয়ে উঠল আমার অন্তরের রঙে রাঙানো এক মানবী। আমি তাকে পেতে চাই। এই পেতে চাওয়ার যে আকুলতা সেই আকুলতা রয়েছে ফুস্‌ফুসের অক্সিজেনের প্রতি। কিন্তু সাহস কোথায় ? আলতাদিকে দাবী করার মতো শক্ত বনিয়াদ আমার নেই। তাছাড়া আলতাদির রুচির দিকটাও রয়েছে। সেই রুচির মাপ কাঠিতে সে অনেক যুবককে মনে মনে ইতিমধ্যেই নাকচ করে দিয়েছে।
আর এক সমস্যা। আলতাদি আমার কাছে নীলা নয় কিংবা শুধু আলতা নয়। তার মুখে আলতা রঙের জন্যে পাড়ার অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে যে নাম পেয়েছে সেই নাম সুন্দর হলেও তার

থেকে 'দি' কথাটাকে বাদ দেওয়ার মতো হিম্মত আমার আছে ও কখনো হবে কিনা জানি না। যদি কখনো হয় আলতাদি সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আমাকে বর্জন করতে। ভাবে—এবারে তুমি যেতে পার দীপ্তেন। তোমার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে ভেবেছিলাম তা নেই। তুমিও আর সবার মতো।

তাই মাঝে মাঝে তার কাছে গেলেও নীলা কিংবা শুধু আলতা বলে একদিনও ডাকতে পারলাম না। সে আমার অশান্ত মনকে আন্দাজ করে একদিন বই-এর আলমারী খুলতে খুলতে মুচকি হেসে বলে—কিছু বলবে দীপ্তেন ?

—আমি ? না তো ?

—তুমি হয়ত একটা কথা ভেবে সঙ্কোচ পাও খুব।

—কোন্ কথা ?

—আমার ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম। সেই কথা ভেবে। তুমিএজন্যে কিছু ভেবো না। আমি জানি ব্যবস্থা করা খুব কঠিন। তুমি চেষ্টাও করছ। এর বেশী কিছু করা সম্ভব নয়।

—না না। এজন্যে সঙ্কোচ হবে কেন ? সঙ্কোচ হলে এখানে আসতাম নাকি। এড়িয়ে যেতে পারতাম।

একখানা বই আলমারীর থেকে বেছে টেনে নিয়ে আলতাদি ছোট্ট করে বলে—পারতে ?

আমার বুকের ভেতরে ধ্বক্ করে ওঠে। তাড়াতাড়ি বলি—মানে, কি বললে তুমি ?

আলতাদি বইখানা খুলে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলে—বলছি, না এসে থাকতে পারতে ?

—না। সেই তো হয়েছে মুশকিল।

আলতাদি এবারে আলমারী বন্ধ করে বলে—মুশকিল কিসের ? উভয় সঙ্কটে পড়ে গিয়েছ ?

—মোটেই না। তোমার জন্যে রীতিমত কাজের চেষ্টা করছি আমি।

আমি নিজে বেকার হলেও, তোমার মতো একজন মেয়ের চাকরী জুটিয়ে দিতে পারব আশা রাখি।
—তাহলে বলতে চাও সঙ্কটটা উভয় নয় একটা।
—হ্যাঁ। সেটা বলতে পার। খাঁটি কথা।
—কোন্ সঙ্কট ?
—এই যে এখানে না এসে থাকতে পারি না।
আলতাদি ঠিক আগের মতো হেসে উঠে বলে—দায়ী আমার রূপ।
—তোমার রূপ ?
—তাই তো মনে হয়। বুদ্ধি হয়ে অবধি তাই দেখে আসছি।
—তুমি মিথ্যে বল নি। নইলে তোমার বন্ধু সুচরিতার পেছনে পেছনে যেতে পারতাম।
—পারতে নাকি ?
—পারতাম না ? তুমি ভাবছ কি আমাকে ? আমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, যখন তাঁর হার্টের অসুখ ধরে নি, তখন কলেজে আমার নাম কি ছিল জান ?
—কি ?
—কী লার।
—ওমা, তাই নাকি ?
—হ্যাঁ। আমি মিথ্যে বলছি ?
—কয়জনকে কাল্ করেছ ?
—একজনকেও না। আমার চেহারা দেখে বলত সবাই।
—একজনকেও নয় ?
—এ সব ব্যাপারে আমি সত্যি কথা বলি। আসলে আমি তেমন বুঝতাম না তখন।
—কিন্তু এর সঙ্গে তোমার বাবার হার্টের অসুখের যোগ কোথায় ?
—হার্টের অসুখ হল বলেই তাঁর চাকরী গেল। ভালো মন্দ না খেয়ে খেয়ে আমার চেহারা তেমন রইল না।

—আলতাদি চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর বলে—তাহলে সুচরিতা রূপসী নয় বলে তার সঙ্গে যাওনি।

—সেটা প্রধান কারণ। অন্য আরও কারণ আছে।

—যেমন ?

—যেমন ধর, সে আমাকে বিশেষ আমল দেয় নি। তবে অমন আমল -না-দেওয়ার ভান অনেক মেয়েই করে থাকে। ও কিছু নয়। তাছাড়া সে গোড়াতেই শুনিয়ে রেখেছে তার নামটি রীতিমত সার্থক। অর্থাৎ তার কাছে ভিড়ে লাভ হবে না। চরিত্রের ব্যাপারে সে কড়া।

আলতা হেসে বলে—বুঝেছি। তুমি আমাকে খারাপ স্বভাবের বলতে চাও।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে প্রতিবাদ করে উঠি—না না। মোটেই তা না। সবটা না শুনে অমন ভেবে বসো না। আধ্যেক সত্যি, মিথ্যের চেয়েও খারাপ।

—বেশ বল।

—আমি জানি সুচরিতার চেয়ে তুমি অনেক, অনেক উঁচুদরের। সুচরিতা যদি রাঁচী-হিল্ হয়, তুমি বিন্ধ্যপর্বত। সে যদি বিন্ধ্যপর্বত হয়, তুমি নির্ঘাত এভারেস্ট।

—বাঃ। সুন্দর কথা বলেছ দেখছি। এবারে পরিষ্কার করে বল, আমি উঁচুদরের কেন ? এর অর্থ কি ?

—এর অর্থ হল, স্বভাবের তুলনা করলেও তুমি সতী-সাবিত্রীর কাছাকাছি। আর তোমার মাধ্যাকর্ষণের আওতায় আমি পড়ে যাওয়ার আসল কারণ হল তোমার মন। এই মন কয়জনার আছে বলতো ? রূপ তো বটেই। সেই রূপ তোমার মনেরও, শুধু দেহের নয়।

—ওঃ; কী ফ্ল্যাটারি। একেবারে মধ্যযুগের নাইট। আচ্ছা মাধ্যাকর্ষণ কথাটা কেমন যেন মনে হল।

—মাধ্যাকর্ষণ বলে ফেলেছি নাকি ? কথার তোড়ে বার হয়ে পড়েছে। ওটা আমার মনের কথা। ওটা থাক।

—মুখে যখন এসে পড়েছে চেপে রাখতে নেই। রাখা খারাপ।
—খারাপ? তুমি বলছ? ঠিক আছে বলেই ফেলি। তুমি হলে পৃথিবী আর আমি হলাম চাঁদ। চাঁদ মানে, চাঁদের মতো সুন্দর বলছি না। ওই মাধ্যাকর্ষণ আর কি। পৃথিবীই তো চাঁদকে টানে। তুমি ভালো করেই জান, আমাকে তুমি টানছ। এর কারণ হলো, তোমার রূপও আছে গুণও আছে কিন্তু পৃথিবী যেমন চাঁদকে তার বুকের ওপর নামিয়ে আনে না —মানে, বলতে চাই একেবারে কাছে টেনে আনে না, তেমনি তুমিও আমাকে একেবারে কাছে আসতে দাও না। শুনলে তো? আমার কিন্তু দোষ নেই। তুমি শুনতে চাইলে, তাই বললাম। আমার দোষ?
আলতাদি একটু চুপ করে থেকে বলে—না, তোমার দোষ নেই।
আমি মনে মনে ভাবলাম, এবারে আলতাদি আমাকে পুরোপুরি চিনে ফেলেছে। এবারে আলতাদির রুচির কাজকর্ম শুরু হয়ে যাবে। সেই কাজকর্ম বেশীক্ষণ চলবে না। একটু পরেই হয়ত ভদ্রভাবে আমাকে আসতে মানা করে দেবে। বুকের ভেতরে কেমন করে ওঠে। ভাবি, যেতেই যদি হয়, আজই যাব। আমিই চলে যাব, আলতাদি কিছু বলার আগেই।
চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলি—আমি চলি।
একটু অবাক হয়ে আলতাদি বলে—এখুনি।
—না। আমি বলতে চাই, তুমি আমার মন জেনে ফেলেছ। আমাকে তো বিদায় করবেই। নিজে থেকে চলে যাওয়াই ভালো। মনে মনে ভাবতে পারব আমার অন্তত আত্মসম্মান জ্ঞান আছে।
আলতাদি সম্রাজ্ঞীর মতো আঙুল তুলে নির্দেশ দেয়—বসো।
আমি আবার ধপাস্ করে বসে পড়ি।
আলতাদি ঘর থেকে বার হয়ে যায়। একটু পরে এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট দিয়ে বলে—তুমি নতুন কিছু নও? ছেলেরা সবাই বোধহয় অমন। রূপ দেখলেই হল। তাতে আমার কিছু এসে যায় না।
আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতেই মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে যায়। বলি—

তোমরা ভাব, ছেলেদের ভালোরকম চিনে ফেলেছ। কিছুই চেনো নি।

—তাই বুঝি?

—আলবাৎ। ধর তুমি একটি সুন্দর ফুল। মধু নেই তাতে। মৌমাছি আসবে ঠিকই। বসবে কি?

আলতাদি হেসে বলে—সব মৌমাছিদের ওই তো দোষ। মধু থাকলেও বেশীক্ষণ বসে না। ভাবে, অন্য জায়গায় আরও মধু আছে। উড়ে যায়।

আমি বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি। তারপর বলি—তুমি বড় হালকা অর্থে কথাটা নিয়েছ। মধু বলতে আমি মনের ঐশ্বর্য বুঝিয়েছি।

—ভালো করেছ। অনেক জ্ঞান হয়েছে তোমার। এবারে তোমার কথা বলতো একটু। ব্যাংক থেকে ধার নেওয়ার কতদূর কি হল?

—এগিয়েছে কিছুটা।

—আশা আছে?

—নিশ্চয়ই আছে। যতক্ষণ 'না' বলে দিচ্ছে।

—ধর তুমি লোন্ পেলে। একটা ফ্যাক্টরী হল তোমার। তারপরে খুব লাভ হতে থাকল। তখন আলতাদির কথা মনে পড়বে?

আমি বিজ্ঞের মতো হেসে বলি—তোমরা খুব কম জান। অথচ তোমাদের ধারণা খুব বেশী জান। এইখানে ট্র্যাজেডী।

—একথা বললে কেন?

—আমি তো হনুমান নই যে বুক চিরে রাম-লক্ষ্মণ দেখাব। তবে মনে রেখো আমরা তরল পদার্থ নই যে দাগ কাটলে সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে।

আলতাদি যেদিনের আশংকায় ঘুম-না-আসা চোখে ক্রমাগত চোখের জল ফেলছিল, সেই দিনটি হঠাৎ এসে গেল। এসে গেল কোনোরকম ভূমিকা না করে। এতে আলতাদি খুবই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

তার বাবা জনক রোড ছেড়ে গুরুসদয় রোডের কাছে একটি ফ্ল্যাটে উঠে গেলেন। উঠে গেলেন একমাত্র কন্যাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে। আপাতত তিনি একাই থাকবেন সেখানে। তারপর নিশ্চয় মিসেস ত্রিবেদী গিয়ে মিলিত হবেন। তিনি চট্ করে কিছু করেন না। অনেক অজুহাতের সৃষ্টি করে দোষগুলো অলকেশ বাবুর ঘাড়ে চাপিয়ে তবে যাবেন।
আলতাদিকে কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—আমি চলিরে নীলা, বুঝতেই পারছিস। তোর কিছু ভাবনা নেই। পরেশের মা রইল। বাড়িভাড়া আর খরচ আমিই দেব। এরপরে সুবিধে মতো একটা ছোট ফ্ল্যাট তোর জন্যে খুঁজে দেব। কোনোরকম চিন্তা-ভাবনা করিস না। মন খারাপ করিস না।
না। আলতাদি অন্তত সেই মুহূর্তে কোনো চিন্তা-ভাবনা করে নি। মনের অবস্থা তেমন ছিল না। শুধু তার পিঠের ওপর বাবার হাতখানা জীবনে প্রথম কাঁকড়া বিছের জ্বালাধরাল। সে একটু সরে গিয়েছিল। তার বাবা হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন।
—কিছু বললি না তো ?
—তোমার খাট, আলমারী—এসব কি হবে।
—সব নিয়ে যাব। কাল একটা লরি আসবে। সঙ্গে আমাদের অফিসের বিষ্টু বাবুকে পাঠিয়ে দেব। বিষ্টু বাবুকে তো তুই চিনিস। সে নিয়ে যাবে সব।
আলতাদি একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—তোমার টাকা আমি বেশী-দিন নেব না। যেটুকু নেব শোধ করে দেব।
—না না, তা কেন! আমার টাকা কি পরের টাকা ? তোর অধিকার আছে, এরপরে তোর বিয়ে দিতে হবে।
আলতাদি তার বাবাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠেছিল—মায়ের ফটোখানা কি করব। মায়ের এ্যালবাম ? বিষ্টুবাবুকে দিয়ে দেব ?
—এ্যাঁ। না না। আমি এখন চলি—

অলকেশবাবু যেন ছুটে পালিয়েছিলেন !

এই ঘটনার কথা আমি জানতে পারি দুদিন পরে জনক রোডে উপস্থিত হয়ে। ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়েই কেমন যেন মনে হল। একটা ছমছমে ভাব। আশপাশের বাড়ির মহিলাদের কৌতূহলী চোখ ছাদের কার্নিশ, জানলার গ্রীল, ব্যালকনির ধার থেকে আমাকে বিদ্ধ করতে থাকে। এসব আগে কখনো লক্ষ্য করিনি আমি। লক্ষ্য করার অবকাশ বিশেষ পাই নি। সেদিন কলিং বেলের বোতাম টিপতে গিয়ে দেখি সুইচটি যথাস্থানে নেই। উপরে নেওয়া হয়েছে। দরজায় টোকা দিলাম। তবু কেউ এসে দরজা খোলে না। তখনই এদিক-ওদিক চাইতে অনেক-জোড়া বালিকা, কিশোরী যুবতী, প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধারও চোখকে দেখতে পেলাম। এই চোখগুলো যদি আতস কাঁচ হত এবং তার ভেতর দিয়ে সূর্যকিরণ বিচ্ছুরিত হত, তাহলে মুহূর্তে ভস্ম হয়ে যেতাম।

ঘাবড়ে যাই। এখান থেকে আলতাদি চলে গেল নাকি ? ভাবলাম, কাউকে ডেকে প্রশ্ন করি। তার আগে দরজাটা আর একবার একটু জোরে ধাক্কা দিলাম। এবারে দরজা খুলে গেল। আলতাদি খুলল।

— একি ব্যাপার ? কলিং বেলের সুইচ খারাপ হয়েছে বলে ওয়ারিংও খুলে নিয়েছ ?

—না। বাবা নতুন বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন। আমি একা থাকি। কয়-জনই বা ডাকবে ? এই তো তুমি ধাক্কা দিলে, আমি খুলে দিলাম। বাবাকে নতুন বেল কিনতে হল না।

আমি তরুণ। তবু এর মধ্যে অনেক কিছু দেখে ফেলেছি। বাবার মৃত্যু দেখেছি, অন্য অনেকের নানা ধরনের বিপদ দেখেছি, এ্যাকসিডেন্ট দেখেছি পথে ঘাটে। তবু আমার যেন কেমন মনে হতে লাগল। কোনো কথা বলতে পারলাম না। আলতাদির পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম, কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে সোফা দেখতে পেলাম না। দাঁড়িয়ে রইলাম। আলতাদি একটা টুল টেনে এনে আমাকে বসতে দিয়ে সবই বলল। আর বলল, সে বেশীদিন অপেক্ষা করবে না। নিজেই নিজের পথ

দেখবে।

আমিজানতেচাইলেওবলল না, কীভাবে সে পথ দেখতে মনস্থ করেছে। চুপ করে থাকতে হল। তাকে সান্ত্বনা দি'তে চাওয়া বৃথা। সে তো এমন একটা পরিণতির কথা ভেবেই রেখেছিল। তবু তাকে বড় অবসন্ন বড় রক্তশূন্য বলে মনে হল।

—তোমার সেই পরেশের মা আছে তো?

—না। তাকেও ছাড়িয়ে দিয়েছি। কী হবে রেখে? নিজের রান্না আর হাট বাজার নিজেই করে নেব।

—রান্না করতে জান।

—ঠাকুমা শিখেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, মেয়েদের এটা হল "মাষ্ট"।

—তোমার প্রতিবেশীদের প্রতিক্রিয়া কি?

—আজকালকার বুদ্ধিমান প্রতিবেশীদের যে প্রতিক্রিয়া হয়—সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ওদের দোষ নেই। অনেক সময় উপকার করব ভেবে নাক গলাতে এলেও অপমানিত হতে হয়।

—ভালো কথা। শুনে কান দুটো জুড়িয়ে গেল। কিন্তু তোমার পক্ষে এভাবে একা থাকা অসম্ভব। আমি ভাবতেই পারছি না। অসুখ-বিসুখও তো আছে।

—আর কি ব্যবস্থা করতে পারি?

—জানি না। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না।

—জানি।

আলতাদি আর কিছু বলে নি। আমিও কিছু বলতে পারি নি। আমার মনে হল, অলকেশ রায় নামে ব্যক্তিটি বাইরে থেকে সজ্জন হলেও আসলে সে পশু। না, পশু না। পশুদের অনুভূতি কম। তাদের অনেক দোষ মাফ করা যায়। তাছাড়া দোষ বা পাপ আসলে কানে করে না তারা সব কিছু করে নিজের চাহিদার জন্যে কিংবা অতলে আত্মরক্ষার তাগিদে অথচ এই অলকেশবাবু। তার নিজের মেয়েকে এইভাবে অভিভাবকহীন অবস্থায় রেখে গেল। একে কি বলব? নিষ্ঠুরতা? হৃদয়হীনতা। না, তার

চেয়েও সহস্রগুণ বেশী কিছু যদি থাকে, তবে তাই।

জনক রোড থেকে ফিরেছিলাম পরদিনই আবার যাব বলে। কিন্তু পরদিন কেন, তার পরে বেশ কয়েকদিন যেতে পারলাম না। ব্যাংক থেকে দশ হাজার টাকার লোন পেয়ে গেলাম। কর্তৃপক্ষ আর একবার আমার ফ্যাক্টরীর জায়গা দেখতে চায়। অনেক সময় নাকি ভুয়ো জায়গা দেখিয়ে লোকে লোন নেয়, পেয়ে গেলে উধাও হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ বলেছে যদি তারা সন্তুষ্ট হয় এবং ছয় মাসের মধ্যে লক্ষ্যণীয় উন্নতি দেখাতে পারি তাহলে আরও দশহাজার টাকা সহজেই মিলবে।

উত্তেজনা আর আনন্দে আমি আলতাদিকে প্রায় ভুলেই গেলাম। আর তখনি প্রমাণ হয়ে গেল আলতাদি আমার কাছে যত বড়ই হোক না কেন, আমার উচ্চাশা আর ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নের চেয়ে বড় নয়। বড় জোর আমার কল্পনার ভবিষ্যতের ওপর আরও একটু উজ্জ্বল রঙ চড়িয়ে দিতে পারে মাত্র। সুতরাং ফুলে যতই মধু থাক না কেন, ভ্রমর নতুন মধুর আস্বাদনে কিংবা অন্য কোনো কারণে ফুলকে ছেড়ে যেতেও পারে।

টাকা অনুমোদিত হয়েছে শুনে তাকে নিয়ে জমি দেখতে গেলাম। টিনের চালা মেরামতের ব্যবস্থা করলাম। কারণ ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ এটাই দেখতে চাইবেন।

অভিজ্ঞতা আমার বিশেষ কিছুই নেই। আমার জামাইবাবুর বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের কারখানা রয়েছে। সেখানে গিয়ে আমি মাঝে মাঝে থাকতাম এবং সবকিছু দেখতাম। তাতেই খানিকটা ধারণা হয়েছে। আর আমার সঙ্গে কিছু কারিগরের পরিচয় হয়েছে যারা এককালে জামাইবাবুর ওখানে কাজ করত। এখন তারা বেকার অবস্থায় বসে রয়েছে। এদের খুঁজে বার করতে আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে।

জামাইবাবুর সাহায্য পেলে অনেক সুবিধা হতো। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক

সম্প্রতি তেমন সহৃদয় নয়। আমি জানতে পেরেছি আমার দুই দিদি যে কারণেই হোক, আমাদের সংসার ফুলে ফেঁপে উঠুক এটা চাইত না। এর জন্যে আমার মা-ও ওদের পছন্দ করেন না। বাবার মৃত্যু হলে এই দুই দিদি আত্মীয় এবং অনাত্মীয়দের মধ্যে রটিয়ে দিল, মাকে আমি খেতে পরতে না দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেব। বাবার শ্রাদ্ধের দিনে, যখন আমি দিশেহারা তখন আমি দিদিদের বড় গলায় এই কথা অন্য অনেককে বলতে শুনেছি। এমন কি দিদির এক জামাই আমার কাছে এসে বিদ্রূপের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিল—মামু, দিদিমা কবে তাঁর মেয়েদের ওখানে যাচ্ছেন?

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মাকে তখন একান্তে ডেকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এ-সবের কারণ হলো বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা কয়টি এবং এই ভাঙা বাড়িটি। এর পরে কিন্তু দিদিরা আর কখনো মাকে নিতে চায় নি। অথচ একঘেয়েমী কাটাতে মা কতবার যেতে চেয়েছেন।

তাই ফ্যাক্টরীর ব্যাপারেও স্বাবলম্বী হব স্থির করলাম। মা বলেন, সৎপথে থাকলে উন্নতি হবে। কারও ক্ষতি চিন্তা না করে এগিয়ে গেলে মানুষ হাতি-ঘোড়া না হতে পারলেও সুখে শান্তিতে থাকে। মায়ের কথাগুলো বড্ড সেকেলে হলেও, এক এক সময় মনে হয় কতকগুলো মূল জিনিষের মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় না। সেগুলো অবিনশ্বর।

ব্যাংক কর্মচারীরা জায়গা দেখে সন্তুষ্ট হলেন। স্থানটিকে পাকা-পোক্ত ভাবে আমি নিয়েছি তার প্রমাণ চাইলেন। দিগম্বর উপস্থিত ছিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও দলিল পত্র দেখাল।

এই আনন্দের সংবাদ মাকে জানাবার পরই মনে পড়ে গেল আলতাদির কথা। ইতিমধ্যে ছয় সাত দিন কেটে গিয়েছে। তবু রওনা হলাম আলতাদির বাড়ি।

আলতাদি বাড়ি নেই। ফ্ল্যাটের দরজায় তালা ঝুলছে। না থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাজের সন্ধানে সে-ও ঘুরছে আমার মতো।

কখন ফিরবে ঠিক নেই। আমি জানি আশেপাশের কেউ খবর রাখে না। আলতাদির কথায় তারা নির্লিপ্ত।

অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করা যায় না। এর পরে কবে আসতে পারব তাও বলতে পারি না। আমাকে তাঁত বসাতে হবে। মোটর কিনতে হবে মেসিনের জন্য। কর্মচারী সংগ্রহ করতে হবে। অনেক কাজ।

স্থির করলাম, চিঠি লিখে জানাব আলতাদিকে। আর তখন প্রথম খেয়াল হলো, আলতাদির বাড়ির নম্বর আমি জানি না। প্রথম যেদিন এসেছিলাম সেদিন মনে ছিল। তারপরে মনে রাখার দরকার মনে করি নি। ফ্ল্যাটের নম্বর দরজার মাথাতেই লেখা যাছে। রোজ চোখে পড়ে। কিন্তু বাড়ির নম্বর জানি না। অথচ আলতাদি অনেকদিন আগে আমার হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে আমাদের কসবার ঠিকানা লিখে দিতে বলেছিল। প্রশ্ন করলে উত্তর দিয়েছিল, ওটা নিতে হয়। তখনো আমি তার ঠিকানা নিই নি।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে ভাগ্যক্রমে বাড়ির নম্বরটা পেয়ে গেলাম। অনেক বাড়িতে এমন পাওয়া যায় না। নম্বর জানে শুধু বাড়ির লোকেরা, পাড়ার দু চারজন এবং পোস্ট অফিসের পুরনো পিয়ন।

একটি কিশোরী আমার কাছে এসে বলে—আলতাদিকে খুঁজছেন তো?

—হ্যাঁ। তুমি কি করে বুঝলে?

—বারে, আপনাকে কত দেখি আসতে।

—কখন ফিরবে তোমাদের আলতাদি?

—আপনি জানেন না? আলতাদি নেই।

—কোথায় গেল?

—জানি না। তিন চারদিন আগে চলে গিয়েছে।

আমি ভীষণ রাম ধাক্কা খাই মনে। প্রশ্ন করি—বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে?

—না। শুধু স্যুটকেশ আর বেডিং নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠেছে।

—তোমার সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে?

—না একটাও না।

—আলতাদির বাড়িতে তুমি বুঝি যাও না?

—আগে কত যেতাম। এখন মা যেতে দেয় না।

—আচ্ছা! তোমাদের আলতাদি ফিরে এলে শুধু বলবে যে দীপ্তেন এসেছিল।

—দীপ্তেন—দীপ্তেন। ঠিক আছে। দীপ্তেন। মনে থাকবে। বাবা যার কাছ থেকে আলু কেনে বাজারে তার নামও দীপ্তেন। হ্যাঁ, ঠিক মনে থাকবে।

—তবে তো ভালোই হলো।

—জানেন, সবাই বলে আলতাদি সিনেমায় নামবে।

হাসার মতো মনের অবস্থা না হলেও হেসে বলি—দেখতে সুন্দর বলে?

—না। ওর বাড়িতে একজন সিনেমার খুব নাম করা লোক এসেছিল॥

আমার একটু কৌতূহল হয়। আলতাদির পরিচিত কেউ সিনেমার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। বলি—কে? নাম কি?

—আমি চিনি না। শুনেছি বড় প্রোডিউসার।

আমার মনের ভেতরে ঝড় ওঠে। আলতাদি শেষে সিনেমায় নামবে? সিনেমায় নামতে হলে তো অত রূপসী হবার প্রয়োজন হয় না। তবে কেন সিনেমায় নামতে যাবে? সুচরিতা বরং চেষ্টা করতে পারে। খেয়াল হয় মেয়েটি এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। তাকে বলি—তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। দেখা হলে আমার কথা বলো। কেমন?

—হ্যাঁ। দীপ্তেন।

আমি চলতে চলতে ভাবি আলতাদি সত্যিই সিনেমায় নামবে? সে নায়িকা হবে? দেখে তো কখনো মনে হয় নি, এমন একটা সখ বা উচ্চাশা তার ভেতরে কখনো ছিল। হয়ত ছিল। আমি আর কদিন দেখছি। সে-তো সখের মঞ্চেও অভিনয় করে। নিশ্চয় নাম আছে। তাই প্রডিউসার বাড়ি বয়ে এসেছে। আগেও আসত, রাজী হয় নি। এখন

নিজের পায়ে দাঁড়াবার তাগিদে রাজী হয়েছে। অলকেশবাবুর ব্যবহারে অমন হয়েছে সে। বলতে গেলে সে ছিন্নমূল। স্রোতের টানে ভেসে গেলেও কিছু এসে যায় না। তার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করার মতো একজন মানুষও পৃথিবীতে নেই।

কারখানা পত্তনের নিত্য-নতুন ঝঞ্ঝামেলায় শ্বাস ফেলার অবকাশ না থাকলেও এবার আমার মন চাপা বিষণ্ণতায় ভরে রইল। এই বিষণ্ণতাকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারি না। কতবার মনে হয়েছে আবার যাই জনক রোডে। হয়ত আলতাদি ফিরে এসেছে। হয়ত সে একঘেয়েমী কাটিয়ে ওঠার জন্যে দু তিনদিন দাঘা কিংবা আশেপাশে অন্য কোথাও গিয়েছিল। একটি কিশোরীর কথাকে ধ্রুবসত্য বলে মেনে নেওয়া উচিত হয় নি। পাড়ার লোকেরা কত কথাই রটায়। কিশোরীর সরল মন তাই বিশ্বাস করে ফেলেছে। তবু কেন যেন পা সরে নি। বাস্কে উঠে নেমে পড়েছি আবার।

আমার কর্মী নিয়োগ করা শেষ হলো। তাঁতও বসল। দিগম্বরের বাবাকে দিয়ে দ্বারোদ্ঘাটন করা হলো। মাকে নিয়ে এলাম। তিনি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সব দেখলেন। মায়ের এই অশ্রু আনন্দের না দুঃখের জানি না। জানতে চেষ্টা করি নি।

মায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম জামাইবাবুকে খবর দেব কিনা। তিনি নীরব ছিলেন। এই নীরবতাকে সম্মতির লক্ষণ বলে ভাবতে পারি নি। খবর দিলাম না। তবু কি ভাবে তিনি জানতে পেরেছিলেন। কোনো কর্মীর মাধ্যমে নিশ্চয়। নিজে না এসে তাঁর এক কন্যাকে পাঠিয়ে ছিলেন। মেয়েটি এককালে আমাকে খুব ভালবাসত। সেটাই স্বাভাবিক। আমি সবারই একমাত্র মামা। কিন্তু এবারে দেখলাম সে অসম্ভব রকম গম্ভীর। একটি কথাও বলল না আমার সঙ্গে। ভাবলাম সেটাই বুঝি ওর স্বভাব। অথবা কচি বয়স থেকে আমার কুখ্যাতি শুনে শুনে তার মন সেইভাবে গড়ে উঠেছে। বুঝতে শিখেছে আমার মতো দুরাত্মা ভূ-ভারতে কেউ নেই। সবার মুখ যখন হাসিতে উজ্জ্বল, সে তখন ফ্যাক্টরীর

মধ্যে ঘুরে ঘুরে যন্ত্রবিশারদের মতো এটা-ওটা দেখে নাক মুখ কুঁচকে এক একটা বেখাপ্পা মন্তব্য করে আমাকে অপদস্থ করার চেষ্টা করল। তার এই ব্যবহারে অন্য সবার সঙ্গে দিগম্বরের বাবা পর্যন্ত অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলেন। যা হোক, ফ্যাক্টরী চালু হলো। সার্থক হলো আমার স্বপ্ন। এইবারে আলতাদিকে গিয়ে বলব—আলতাদি তোমার ব্যবস্থা আমি করব। শুধু মুখ ফুটে বল, কী ধরনের ব্যবস্থা তুমি চাও।

একদিন দৃঢ় পদে এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে জনক রোডের ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আবার ধাক্কা খেলাম। তালা তখনো ঝুলছে। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। একটা প্রত্যাশা অঙ্কুরে শুকিয়ে গেল। আশেপাশের কার্নিস, ব্যালকনি জানলায় আজ আর কেউ নেই। নিচে নামলাম ভারি পা নিয়ে। এদিকে ওদিকে চেয়ে চেয়ে সেদিনের সেই কিশোরীকে খুঁজে বার করার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। না, সে আজ নেই।

ধীরে ধীরে ট্রাম লাইনের দিকে অগ্রসর হলাম। সোজা চলে যাব দিগম্বরের বাড়িতে।

পেছন থেকে নারী কণ্ঠে কে ডাকল—শুনছেন?

—দেখলাম এক তলার একটি জানলা দিয়ে একজন আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। তবু নিঃসংশয় হতে পারি না। অন্য কাউকে ডাকছে হয়তো।

হাতছানি দিয়ে সে বলে উঠল—আপনাকে।

এগিয়ে গিয়ে চিনতে পারলাম। সুচরিতা।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি—আপনি এ পাড়ায়? লেকভিউ না?

—এ পাড়ায় থাকি না। এটা আমার এক রকমের মাসীমার বাড়ি। মাঝে মাঝে আসি।

—সেই সূত্রেই বুঝি—

—আপনার আলতাদি? না, ওর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র হলো লরেটো। একসঙ্গে পড়তাম।

সুচরিতাকে গম্ভীর প্রকৃতির মনে হতো। আজ যেন বড় বেশী প্রগলভ। অবাক হলাম!

—আমি চলি।

—দাঁড়ান। আমি আসছি।

আরও অবাক হলাম। তবে খুশীও হলাম। কারণ আলতাদি সম্বন্ধে পাকা খবর জানার সম্ভাবনা রয়েছে। সুচরিতার জানলার পেছনে আরও দু তিনটে মসৃণ মুখের হদিশ প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যেও পেয়েছিলাম। ইচ্ছে থাকলেও আলতাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারি নি।

সুচরিতা একটু পরে বাইরে এসে বলে—চলুন।

—কোথায়?

—চলুন। ট্রাম লাইন অবধি। তারপর দেখা যাবে।

—ক্রিকেট খেলা বন্ধ করলেন কেন?

—জানেন না?

ওর কথা বলার ধরনে একটা বিশেষ অর্থ ছিল। যার ফলে আমাকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতে হলো।

সুচরিতা আবার প্রশ্ন করে—আপনি সত্যিই জানেন না?

—না। আলতাদি কিছু বলে নি এ সম্বন্ধে।

—আলতাদি? সে কি করে বলবে? বলার মুখ আছে নাকি?

এবারে আমি বিস্মিত হই এবং বিচলিত বোধ করি। চলতে চলতে থেমে গিয়ে প্রশ্ন করি—কেন? কি হয়েছে?

—আপনি ওর বাবার কীর্তি কাহিনী শোনেন নি বলতে চান?

—হ্যাঁ, শুনেছি। তাতে খেলা বন্ধের কি হলো?

—ওই পরিবারের মেয়ের সঙ্গে আমার বাড়ির লোকেরা মিশতে দেবে কেন?

—কিন্তু আপনার বন্ধুত্ব? তাছাড়া আলতাদিকে আপনি ভাল ভাবে চেনেন।

—দেখুন, আপনার মুখে আলতাদি কথাটা আমার অসহ্য মনে হয়। নীলা বলুন

এবারে আমি একটু গম্ভার হয়ে বাল—আমার মুখে আলতাদ শোনার

দুর্ভাগ্য আপনার হওয়ার সুযোগ নেই। আমি আলতাদিই বলব। নীলা বলা অভ্যাস নেই।

—ও। বুঝতে পেরেছি। ভালো লাগে। তাই বুঝি ঘন ঘন ওর কাছে আসতেন?

সুচরিতা বেহায়ার মতো হাসতে থাকে।

—আমি ঘন ঘন আসি, একথা আপনাকে কে বলল?

—এ পাড়ার সবাই আপনাকে চেনে। আমার মাসীমাই আপনাকে দেখিয়ে দিলেন আজ।

—বেশ নাম করে ফেলেছি তো?

—তা করেছেন। যথেষ্ট নাম করেছেন।

—ইতিমধ্যে অনেক কাহিনী রটেছে নাকি।

—হ্যাঁ। সেটা অন্যায় কি? ওর কাছে প্রায়ই যাচ্ছেন আপনি, আর রটলেই দোষ? অমন বাপের মেয়ে কেমন হয়।

মাথার ভেতরে আগুণ জ্বলে ওঠে। মুখে বলি—যা বলেছেন।

সুচরিতা বিদখুটে ধরনের হাসি হেসে বলে—এবারে কি করবেন? পাখী যে উড়ে গেল?

—আবার যদি ফিরে আসে—সেই প্রতীক্ষায় থাকব।

—আর ফিরে আসবে না। ফিরে এলেও লেগ-ব্রেক বলে তার উইকেট ফেলতে পারবেন না।

কঠিন অথচ সহজ স্বরে বলি—গুগলি দেবার চেষ্টা করবো।

—তাই নাকি? গুগলি দিতে হলে ট্যাকের যথেষ্ট জোরের প্রয়োজন হবে। আপনার সাধ্যে কুলোবে না। যে ফিরে আসবে সে আগের আলতাদি নয়।

—বেশ তো ট্যাকের জোরই দেখাতে চেষ্টা করবো।

ভ্রূ কুঁচকে সুচরিতা আমার মুখের দিকে চায়। তারপর বলে—আপনার কথার কায়দায় মনে হচ্ছে সলোমনের খনির সন্ধান পেয়ে গিয়েছেন।

—সন্ধান পেয়েছি বলতে পারেন। তবে এখনো খনির কাজ তেমন শুরু

হয় নি।

সুচরিতার বাঁকা বাঁকা কথা বন্ধ হয়ে যায়। সে একেবারে সাধারণ মেয়ের উলঙ্গ কৌতূহল নিয়ে বলে—চাকরী পেয়েছেন? ভালো চাকরী বুঝি?

—না, চাকরী নয়। একটা কারখানা খুলেছি। কপালে থাকলে উন্নতি হবে।

সুচরিতা আগ্রহে ফেটে পড়ে। একটার পর একটা প্রশ্ন ছুঁড়তে থাকে সে। আমি যতটা সম্ভব জবাব দিয়ে যাই।

সে বলে—আমি গিয়ে দেখে আসব একদিন।

—ঠাট্টা করছেন?

—ইস্, আপনি সবটাতেই ঠাট্টা দেখেন। আমি বুঝি সহজভাবে কিছু বলতে পারি না?

মনে মনে ভাবি, ঈশ্বর জানেন। মুখে বলি—আলতাদি কোথায়, বলতে পারেন?

—উঃ কী মোহ। একেই বলে পুরুষের মোহ। বিচার শক্তিও লোপ পায়।

—পায় নাকি? কাকে পেতে দেখলেন?

—অমনি রাগ হয়ে গেল। আমি রাগের কথা বলি নি কিন্তু। আপনার ভালোর জন্যেই বললাম। নীলাকে সত্যিই আর খুঁজে পাবেন না। কে. পি. শেঠীকে চেনেন? বম্বের সিনেমা লাইনের ম্যাগনেট।

—চিনি না।

— চিনে রাখুন। অন্তত নামটা মুখস্থ করে রাখুন। এ-লাইনের কাউকে জিজ্ঞাসা করলে বলে দেবে। সেই লোকটি নিজে এসেছিল, নীলার ফ্ল্যাটে। কী কোরে খোঁজ পেলো সেটা একটা রহস্য। রূপালী পর্দায় আর রাস্তায় পোস্টারে তার রূপ দেখতে পারেন। তবে তার আগে তাকে একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

—প্রসেস্। কিসের প্রসেস্?

—এটাও বুঝিয়ে বলতে হবে ? এ-যুগের যুবক হয়েও বুঝতে পারলেন না ? আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠি। সুচরিতার কাছ থেকে কোনোরকমে বিদায় নিয়ে দিগম্বরের বাড়িতে যাই। ভাগ্যক্রমে সেখানেই দেখা হয়ে গেল তার সেই মামার, যিনি সিনেমার পরিচালক হিসাবে শেষ বইটা রিলিজ হবার পর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

আমার অনুরোধে দিগম্বর তাকে সব কথা বলল। শুনে তিনি কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থাকলেন। তারপর শুধু বললেন—ভালো হাতে পড়ল না। মেয়েটি নষ্ট হয়ে যাবে।

কথাটার মর্মার্থ অনুধাবন করে আমি শিউরে উঠি। নিজেই বলে ফেলি —এখানে একটা চান্স করে দিন।

ভদ্রলোক একটু ভেবে নিয়ে বলেন—দেখতে কেমন !

—খুব ভালো। অত ভালো পাওয়া যায় না।

ভদ্রলোক হেসে ফেলেন। বলেন—সেই ভালোর কথা বলছি না। ছবিতে কেমন দেখায় ?

দম বন্ধ করে বলি—ওর ছবি আমি দেখেছি। চমৎকার দেখায়।

—অভিনয় ?

—জানি না। শুনেছি নাটকে অভিনয় করে মাঝে মাঝে।

—শোন। তুমি দিগম্বরের বন্ধু। তোমাকে আমি চিনি। মেয়েটি তোমার কে হয় জানি না। তবে আমার একটা বই শিগগিরই শুরু হবে। যদি মোটামুটি অভিনয় করতে পারে, আমি চান্স দিতে পারি।

—কিন্তু তার ঠিকানা যে আমি জানি না।

—তবে আর কি করবো ?

—আপনি কতদিন অপেক্ষা করতে পারবেন ?

—বড় জোর বিশ বাইশ দিন।

মামা চলে যাবার পর দিগম্বর বলে—তুই একটা সিন্ ক্রিয়েট করলি মামা কি ভাবল বলতো ? এতদিন তোকে গুডিগুডি ভাবতো।

—তুই বুঝবি না।

—আমি ? আমি তো মানুষ। আমাদের কাব্‌লী বেড়ালটাও বুঝতে পেরেছে। দেখলি না তোর পায়ের সঙ্গে মোটা লেজ ঘষে সহানুভূতি দেখাচ্ছিল ?

—ঠাট্টা করিস না। ভালো লাগছে না।

—না। মোটেই ঠাট্টা করছি না। ভাবছি এতবড় একটা ঘটনার কথা ঘুণাক্ষরেও আমাকে জানাস নি আগে। আর একটা কথা। এই সময়ে তোর মাথা বিগ্‌ড়ে গেলে কারখানার বারোটা বাজবে। আমরা বিজিনেস্‌ বুঝি। কথাটা বলে রাখলাম।

দিগম্বর আমার প্রকৃত হিতৈষী। সে অন্যায় বলে নি। তবু আমি স্থির থাকতে পারি না। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হতে থাকে একজন স্থূলকায় ব্যক্তি থপ্‌থপ্‌ করে আলতাদির দিকে এগিয়ে আসছে। আমি স্পষ্ট শুনতে থাকলাম আলতাদির আতঙ্কিত চিৎকার।

দুদিন এইভাবে ক্রমাগত চলল। আমি কি পাগল হয়ে যাব ?

অবশেষে দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে মায়ের কোলের ভেতরে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেললাম।

মা প্রথমটা কিছুই বললেন না। স্থির হয়ে বসে থেকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। তারপর আমি একটু শান্ত হলে তিনি বললেন—এবারে বল্‌।

আমি বললাম। সব বললাম। একটি কথাও গোপন করলাম না।

মা মন দিয়ে শুনলেন। কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপরে বললেন—মেয়েটি যদি খাঁটি হয়, তাহলে তার ওপর দিয়ে যত ঝড়-ঝাপটাই যাক না কেন, আমি নিতে রাজী আছি। তবে একটি মাত্র সর্তে। তোর ওপর তার ভালবাসা থাকা চাই।

আমি 'থ' হয়ে যাই। সত্যিই তো, এত কিছুর মধ্যে এ কথাটা একবারও মনে হয় নি। আমার প্রতি আলতাদির মনোভাব কিরকম ? আমার প্রতি তার সহানুভূতি খুব স্পষ্ট। আমার উদ্যোগে সে উৎসাহ দেয়। তার মিষ্টি স্বভাব আমাকে ভুলপথে নিয়ে যায় নি তো ? সে আমার

সঙ্গে নিশ্চিন্তে মিশতো, কারণ সে জানতো তার ক্ষতি করার মতো বেপরোয়া শক্তি আর সামর্থ আমার নেই।

দুদিন পরে বিকেলের দিকে ফ্যাক্টরী থেকে বার হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা ট্যাক্সি এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। ভাবলাম দিগম্বর এসেছে। কারণ আর কারও আসার সম্ভাবনা ছিল না। দিগম্বরের প্রাইভেট কার আছে নিজের। কোনো কারণে আনতে পারে নি। সে আসলে গল্প করে কিছুটা সময় কাটে। আমি হিসাবের খাতা টেনে নিয়ে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে থাকি। সেই সময় দরজায় মেয়েলি কণ্ঠ—আসতে পারি ?

সুচরিতা দাঁড়িয়ে হাসছিল। আমি ভাবতে পারি নি। একটু থতমত খেয়ে বলি—আপনি ?

—চলে এলাম। কেন, অন্যায় করেছি ?

—না, অন্যায় কেন ?

—আমি একটু দেখব। দেখাবেন ?

—দেখার মতো কিছু নয়। ছোট্ট কারখানা। সবে শুরু হয়েছে।

—ছোট থেকেই বড় হয়। বীজ থেকে মহীরুহ।

ভাবলাম বড় বড় কথা বলছে কেন সুচরিতা ? এটাও কি বিদ্রূপ ! সলোমনের খনিতে কেমন কাজ চলছে নিজে যাচাই করতে এসেছে ? গুগলি বল দেওয়া কতটা রপ্ত হলো দেখতে চায় ?

আমি লক্ষ্য করি সুচরিতা খুব আগ্রহের সঙ্গে সব দেখল। এই আগ্রহে কোনো খাদ নেই। যে সব প্রশ্ন করল, খুব বুদ্ধি যুক্ত।

সৌজন্য দেখিয়ে বলি—একটু চা খাবেন ? অবিশ্যি ভালো চা খাওয়াতে পারব না। এখানে তেমন দোকান নেই। তাছাড়া বাতাসে পচা চামড়ার গন্ধ।

—তাতে কি ? চামড়ার গন্ধ টি. বি.-র পক্ষে খুব ভালো। তবে চা খাব

না। ট্যাক্‌সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। চলুন না একসঙ্গে যাই। আপনি কতক্ষণ থাকেন?

—এই সময়েই যাই।

—বেশ ভালো হলো, চলুন।

ভাবলাম, ট্যাক্‌সিতে গেলে সময় বাঁচবে। আমি ট্যাক্‌সিতে গিয়ে বসি। সে ড্রাইভারকে সোজা লেকে যেতে বলে।

প্রশ্ন করি—লেকে গিয়ে কি হবে?

—একটু বসব। গল্প করবো। কেন আপনার আপত্তি আছে?

—আমি যে বেশীক্ষণ বসতে পারবো না। কয়েকটা কাজ আছে।

—অল্পই বসবেন।

লেকে পৌঁছে, ঘাসের ওপর বসি দুজনে। আমি চুপচাপ অপেক্ষা করি আর ভাবি সুচরিতার এই পরিবর্তনের হেতু। বড় বেশী সহৃদয়তা দেখাচ্ছে সে।

সহসা সে বলে—আপনার আলতাদির খবর কি?

-জানি না তো।

—জানবার আর চেষ্টা করবেন না।

—চেষ্টা একটু করতেই হবে।

এবারে সার্থক নামা সুচরিতা এক কাণ্ড করে বসল। সে খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরে বলে—কেন রূপসী নই বলে কি আমি এতোই কুৎসিত যে তোমার মন পেতে পারি না? আমার মনটি কি নারীত্বের গুণ দিয়ে ভগবান সৃষ্টি করেন নি?

—আপনি এসব কী বলছেন?

—ঠিক বলছি। তুমি অন্ধ। তাই তোমার দৃষ্টি একজনের রূপের ওপর বরাবর আটকে রইল। আর একজন যে নীরবে বিদায় নিয়ে চলে গেল এই লেক থেকে সেটুকু দেখার চেষ্টাও করলে না।

আমার শীতের গোধূলিতেও গরম লাগে। এধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে একেবারে প্রথম। দারুণ একটা রোমাঞ্চভাব রয়েছে এতে। সুচরিতার

চোখ দুটো ছলছল করছে। সুযোগ পেলে সে কেঁদে আমার গায়ের ওপর ভেঙে পড়তো।

তাড়াতাড়ি বলি—ওসব কথা এখন থাক সুচরিতা। অন্যদিন হবে।

—কেন? অন্যদিন কেন? আমি কি এতই অপদার্থ?

—অপদার্থ? কে বলল? তা নয়। আমাকে একটু সামলে নিতে দাও। মাথার ভিতর তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে।

সুচরিতা এবারে সত্যিই কাঁদে। বলে—বুঝেছি। আমি নীলা নই। নীলা আজ যদি এভাবে বলত তুমি কি করতে?

—তা তো জানি না। বলতে পারব না।

কোনোরকমে বিদায় নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে আসি।

মা বলেন—তোর একটা চিঠি এসেছে।

—চিঠি কে লিখেছে মা?

—জানি না। খামে। মনে হয় সেই মেয়েটি।

আলতাদি! চিঠি দিয়েছে আমাকে? ঠিকানা দিয়েছে তো? মা চিঠিখানা এনে হাতে দিতেই আমি ঠিকানা দেখি। আলতাদির হস্তাক্ষর আগে কখনো দেখি নি। তাই খাম ছিঁড়তে ছিঁড়তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই মায়ের অনুমান যেন সত্য হয়।

হ্যাঁ। আলতাদি। দীর্ঘ চিঠি।

দীপেন,

তোমাকে কি ভাবে সম্বোধন করব এখন ভেবে দেখার অবকাশ নেই একটুও। যেমন ডাকতাম, তেমনি লিখলাম। মনে কিছু করো না। বয়সে তুমি আমার চেয়ে দু বছরের বড়। মুখে অস্বীকার করলেও, লেখার মধ্যে অস্বীকার করতে নেই।

আমার এই চিঠি প্রথম এবং শেষ দুই-ই হতে পারে। এরপর ভাগ্য আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে কিছুই জানি না।

ঠিকানা দেখে বুঝতে পারছো কোথায় এসেছি। তবে আসার আগে বেশ কয়েকটি দিন তোমার জন্যে আকুলভাবে অপেক্ষা করেছিলাম। তোমার সঙ্গে পরামর্শের বড় প্রয়োজন ছিল। সিদ্ধান্ত নিতে অনেক দ্বিধাবোধ করেছিলাম। কিন্তু তুমি এলে না। কেন এলে না জানি না। হয়তো অনেকের কাছে আমার নামে অনেক কথা শুনে থাকবে। তোমার মন ভেঙে গিয়েছে। খুব স্বাভাবিক। তোমার কোনো দোষ নেই দীপ্তেন। পাড়ায় যারা আমাকে ছেলেবেলা থেকে চেনে, আমাকে যারা স্নেহ করত, তারাও কেমন হয়ে গেল দেখতে দেখতে। আমাকে দেখলে তারা আর হাসতো না। শেষে মুখ ফিরিয়ে নিতো। যারা আমায় আলতা-দি বলে কাছে ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়াত তারাও দূর থেকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকতো। কাছে ডাকলেও মাথা ঝাঁকিয়ে 'না' বলে ছুটে পালিয়ে যেতো। অথচ প্রতিবেশীদের অনেকেই আমার মাকে চিনতো। মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও ছিল।

তোমাকে চিঠি লিখছি, কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্যে নয়। যেটুকু দিলাম নিজের তাগিদে। এখনো আমার কেন যেন বিশ্বাস, অন্তত তোমার কাছে আমার কৈফিয়তের কিছুটা মূল্য রয়েছে। ভুল হ'তে পারে। তবু এই ভুলটুকু নিয়েই আমার আশা আমার সান্ত্বনা।

আমি বড় বিপদগ্রস্ত দীপ্তেন। এরচেয়ে বিপদ মেয়েদের জীবনে ঘটে না। আমি সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মতো অল্পেতে নিজেকে অসহায় ভাবি নি কখনো। পৃথিবী সম্বন্ধে আমার মোটামুটি একটা ধারণা আছে বলে জানতাম। এখন বুঝছি, আমি কিছুই জানতাম না।

আমি চরম বিপদের মধ্যে আছি দীপ্তেন। এই বিপদ থেকে বাঁচতে হলে আমাকে বিরাট ঝুঁকি নিতে হবে। সেই ঝুঁকি সফল হবে কিনা বলতে পারি না। সফল হলেও, তারপর কোথায় গিয়ে দাঁড়াব বলতে পারি না। হয়ত ম্যারিন ড্রাইভের পাশে নোনা জলে আমার দেহ ভেসে উঠবে। তাই তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। কেন যেন মনে হল তোমাকে জানানো আমার কর্তব্য।

যে লোকটি আশা আর উৎসাহ দিয়ে আমাকে এখানে এনেছে দেহটা তার মানুষের মতো হলেও আসলে সে পশু। মস্তিষ্ক তার শয়তানের। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই। যে-কোনো মূল্যে এই মুক্তি আমায় নিতে হবে। এতদিন ধরে আমি ক্রমাগত যুদ্ধ করে চলেছি। তুমি বুঝবে না, কী ধরনের যুদ্ধ আমাকে করতে হচ্ছে। ছেলেদের বোঝার সুযোগ নেই। আমাকে ধস্তাধস্তিও করতে হয়েছে একদিন। আমার কপাল কেটে গিয়েছে। দেয়ালে গাল ঘষে গিয়ে চামড়া উঠে গিয়েছে। ডেটলও লাগাতে পারি নি।

ওই লোকটি, আমি পালিয়ে যাব ভেবে আমার স্যুটকেশ জোর করে নিয়ে গিয়েছে। আমি এখন নিঃসম্বল। ছু বেলা ছুটো খেতে দেয়। হোটেলে বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। তবে দয়া করে আমাকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখে নি। ইচ্ছে করলে আমি চলে ফিরে বেড়াতে পারি। আমি ছুবেলা রাস্তায় বার হই আর উদ্‌গ্রীব হয়ে চেনা মুখের সন্ধানে ফিরি। কাউকে দেখতে পাই না। চেনাশোনা লোক এখানে রয়েছে ছু চারজন। তাদের ঠিকানা জানি না।

আমি কি করব জানি না। তুমিই বা কি করবে, তবে তুমি করতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি করতে।

আলতাদির কাছে তোমার মনের কপাট একদিন খুলে দিয়েছিলে মনে আছে? বিদায়ের সময়ে তোমাকে শুধু এইটুকু বলে যেতে চাই, যে যাই বলুক আলতাদির মধ্যে এতটুকুও কৃত্রিমতা নেই, তুমি বিশ্বাস করতে পার। ইতি—

তোমার
আলতাদি।

চিঠি পড়া শেষ হতেই আমি উঠে পড়ি। মা দাঁড়িয়েছিলেন চৌকাঠের কাছে। তাঁর হাতে চিঠিখানা দিয়ে বলি—আমি আসছি।

—কখন ফিরবি?

—ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। টেলিগ্রাম মনি অর্ডার করতে হবে। আলতা-

দিকে চলে আসতে বলব। চিঠিখানা একটু দাও তো ঠিকানা লিখে নিই।

—ঠিকানা লিখে মাকে চিঠি ফিরিয়ে দিয়ে রওনা হই।

কারখানায় বসে দিগম্বরের উক্তিটি মনে পড়ল। সে বলেছে, মাথা বিগড়ে গেলে বিজিনেস চলে না। খুব ছোট্ট কথা। খুব দামী কথা। মাথা আমি ঠাণ্ডা করে ফেলেছি। যে জিনিষ আমার ক্ষমতার বাইরে তার জন্যে আকুলি বিকুলি করে লাভ নেই। যা করতে আমি সমর্থ, পুরোপুরি তার সদ্ব্যবহার করব। আলতাদির ব্যাপারে এখন আমার করণীয় কিছু নেই। অশান্ত মন নিয়ে জগতের প্রায় সব পুরুষই কর্তব্য করে যায়। আমিও করব। আলতাদি আমার টাকা নিশ্চয়ই পেয়েছে—যদি সেই লোকটার হাতে না পড়ে। আলতাদিকে চলে আসতে বলেছি। সে নিশ্চয় চলে আসবে। আসার আগে খবর দিয়ে আসার সুযোগ কখনো সে পাবে না। দিন পাঁচেক পরে তার বাড়িতে গেলেও চলতে পারে। কিংবা আলতাদি নিজে আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হতে পারে।

ইতিমধ্যে সুচরিতা আমার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছে। তাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। সে আলতাদি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে। এমন সব ঘটনার কথা বলে যা শুনলে কারও পক্ষে অবিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু আমি আলতাদিকে খারাপ বলে ভাবতে পারি না। তার পত্রখানি আমার মনে স্থায়ী রেখাপাত করে ফেলেছে। শেষের দু এক লাইন পড়ে মা মন্তব্য করেছিলেন—মেয়েটি খাঁটি। আমি জানতাম, ওই ধরনের চিঠি মা পছন্দ করেন। তিনি বরাবর বলে থাকেন, উচ্ছ্বাস প্রবণতার মধ্যে অনেক খাদ মেশানো থাকে। উচ্ছ্বাস যত কম, তাদের সম্ভাবনাও তত কম। আলতাদির চিঠির মধ্যে উচ্ছ্বাসের বাষ্প বলতে গেলে কিছুই নেই।

কয়েকদিন পরে জনক রোডের বাসিন্দাদের চোখ এড়াবার জন্যে সন্ধ্যের পরে সেখানে গেলাম। যথারীতি তালা ঝুলছে। নিরাশ হলাম। ফিরে

এলাম। ভাবলাম, আর যাব না। আলতাদি ফিরে এলে নিজেই যোগা-যোগ করবে।

আরও তিনদিন পরে সুচরিতা এলো কারখানায়। তার আসার সময়-নির্বাচন ভালই হয়েছে। সে আসে আমি কারখানা ছাড়ার আগের মুহূর্তে। ট্যাকসি করে আসে। সেই ট্যাকসিতে আমি যাই। ভাড়া সে নিজেই মিটিয়ে দেয়। আমাকে কিছুতেই দিতে দেয় না। অথচ এখন মাঝে মাঝে অন্তত ভাড়া দেবার মতো সঙ্গতি আমার হয়েছে।

সুচরিতা এসেই ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—আজ আমি কিছুতেই আর লেকে যাবো না।

—বেশ তো। সোজা বাড়ি চলে যাব।

সুচরিতার চোখের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে গম্ভীর হয়ে বলে—আমি তাই বলেছি? চল না অন্য কোথাও?

—কোথায়? সিনেমায়?

—না। ধর ময়দানে কিংবা—

—কিংবা?

— চল। আমি দেখিয়ে দেব। একটা সুন্দর পার্ক আছে থিয়েটার রোডের কাছে। কেউ যায় না। যারা যায়, তারা থাকলেও অসুবিধা নেই।

—কিসের অসুবিধা?

সুচরিতা আমার পিঠের ওপর আস্তে কিল মেরে বলে—জানি না যাও।

ওর এই সব ভাব-ভঙ্গির ভেতরে একটা নতুনত্বের স্বাদ আছে বটে। তবে মন ভরে না। ও আমার মনে কোনো সুর তুলতে পারে না। আলতাদির সঙ্গে পরিচয় না হলে হয়তো তুলতে পারতো। আলতাদি আমার মনকে আরও অনেক সূক্ষ্ম সুরে বেঁধে দিয়েছে। তার তুলনা নেই। সুচরিতা যদি আধুনিক গান হয়, আলতাদি রাগ সঙ্গীত। সুচরিতার মধ্যে চটক আছে, মূর্ছনা নেই।

ওকে বলি—বেশ চল, তোমার সেই পার্কেই যাওয়া যাক।

সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ট্যাকসিতে ওঠে।

পার্কটি সত্যিই নির্জন। সুচরিতা এত খোঁজ রাখে কি করে! অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। গাড়িতে সব জায়গায় ঘোরাফেরা করে। খোঁজ রাখা সম্ভব।

অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সুচরিতা আমার পাশে বসে বসে আবোল তাবোল বকে চলে। সিনেমার স্টার-শ্রেণী ভুক্ত নায়িকাও এতো বক্‌বক্ করার সুযোগ পায় না। তাতে অনেক রীল নষ্ট হয়। তা ছাড়া সুচরিতা যা বলে চলে, সেই সব কথাও বলতে পারে না। সেন্সরের কাঁচি খচ্‌খচ্ করে কাজ করতে শুরু করবে।

আমার ভেতরে বেশ একটা উত্তেজনা ভাব দেখা দেয়। কান দুটো বেশ গরম হয়ে ওঠে। সারা মুখে আগুন ছোটে। সুচরিতা আমার গাল দুটো হাত দিয়ে অনুভব করে। তারপর হঠাৎ আমার কোলের ওপর শুয়ে পড়ে দুহাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আমার মাথাটাকে তার দিকে টানতে থাকে।

—এই। এ কি করছো?

সুচরিতা ভাঙা ভাঙা হাসি হেসে বলে—কেন? দাবী নেই?

—না। তা বলছি না।

—তবে? অমন জড়োসড়ো হয়ে গেলে কেন? তোমার পুরুষত্ব কোথায় গেল? কোথায় গেল লেগ-ব্রেক? ফাস্ট বল করতে পার? উইকেট ভেঙে চুরমার করে দাও তো দেখি কেমন পার? তবে বুঝব লিণ্ডওয়াল, ট্রুম্যান, টাইসন্—তবে বুঝব হল্, গিল্‌ক্রিষ্ট, নিসার।

সুচরিতা হেসে আমাকে আরও জোরে চেপে ধরে। তার হাসি আমাকে আরও আড়ষ্ট করে তোলে। অথচ আমার ভেতরের স্টীমইঞ্জিনের বাষ্প অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে চারদিকে ছোটাছুটি করে মাথা কুটছে কোথায় একটু ফাঁক পাওয়া যায়। কোন্ ফাঁক দিয়ে বাইরে বার হওয়া যায়।

সুচরিতা বলে —এখনো তোমার সেই আলতাদির কথা ভাবছ বুঝি? তার তো খারাপ ব্যারাম হয়েছে।

চমকে উঠে বলি—খারাপ ব্যারাম?

—হ্যাঁ গো মশায়। বম্বে ফেরতা মেয়েদের যা হয়। গোড়া থেকে এত বেশী ফাষ্ট-লাইভ লীড করছিল যে এরই মধ্যে সে প্রডিওসারদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। নাকচ হয়ে গিয়েছে। কেউ চান্স দেয় নি।

—এত খবর তুমি জানলে কি করে?

—সেই শেঠী নিজে বম্বে থেকে তিনদিন আগে ফ্লাই করে এসে পাড়ায় বলে গিয়েছে। টি টি পড়ে গিয়েছে। গেলেই শুনতে পাবে।

—আর আলতাদি? সে কোথায়।

—জান না? তুমি জান না বলতে চাও।

—না সত্যিই জানি না সুচরিতা।

—খুব স্বাভাবিক। সে তোমাকে কোন্ মুখে জানাবে? মুখ যে পুড়িয়ে এসেছে। মুখে কত কাটা দাগ। কপালে রক্ত জমে আছে। বোধহয় ড্রিঙ্ক করত খুব। সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল এই ভাবে চললে মন জয় করতে পারবে। তবু আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। মাসীমা কত মানা করলো। আমি বললাম—না। শত হলেও সে আমার এককালের বন্ধু। দুঃসময়ে আমি না গেলে কে যাবে? কিন্তু এখন ভাবি, না গেলেই ভালো হতো। সে বিশেষ কিছু বলল না। আমি একা বকবক করে মরলাম।

আমার চোখের সামনেটা কেমন যেন হয়ে গেল। সুচরিতার হাত দুটো নর্দমার কাদা-মাখানো দড়ি বলে মনে হলো। আমি তাড়াতাড়ি সেই দড়ির ফাঁস খুলে উঠে দাঁড়াই। তারপর পার্কের রেলিং টপকে হন হন করে চলতে থাকি। সবটাই করলাম একটা ঘোরের মধ্যে।

একটু পরে সুচরিতার চিৎকার শুনে আমার ঘোর কেটে যায়।

সে কাছে এলে বলি—আমাকে ক্ষমা কর সুচরিতা।

—ক্ষমা? ক্ষমার কিছু নেই। তোমাকে ও ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে। ভেড়াকে ক্ষমা করা আর না করা দুই-ই সমান। কারণ ভেড়ার বুদ্ধি থাকে না, সম্ভ্রমবোধ তো নেই-ই।

—তোমার কথা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারছি না। হয়তো আমি

ভেড়া।

—সেই জ্ঞান হয়েছে যখন, চল আবার পার্কে গিয়ে বসি।

—না। আজ একবার যেতেই হবে জনক রোডে। দেখে আসতে হবে।

—বেশ যাও। আমি বাধা দিলে তো শুনবে না। আমি তোমার কে?

একটা ট্যাকসিতে সুচরিতাকে সঙ্গে নিয়ে উঠি। তাকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে জনক রোডের মোড় ট্যাকসি ছাড়ি।

আলতাদির ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছিল। সে আছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে কড়া নাড়ি।

আলতাদি দরজা খোলে। এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। কোনো কথা বলে না। সে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে। দেখে মনে হয় শক্ত অসুখ থেকে উঠেছে।

মনের ভেতরটা অশান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তার ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে সংযত ভাবে বলি—আমাকে বসতে বললে না?

—এসো।

যন্ত্রচালিতের মতো সে আমাকে নিয়ে চলে। বসবার ঘর ছেড়ে সে আরও এগিয়ে যায়।

—কোথায় চললে?

আলতাদি দাঁড়ায়। মৃদুস্বরে বলে—এখানে বসার কিছু নেই। আমার ঘরে এসো।

তার বিছানার ওপর সে আমাকে বসতে দেয় কিন্তু কোনো কথা বলে না। তবে কি সুচরিতা যা বলেছে মিথ্যে না? অস্বস্তিতে মন ভরে ওঠে। কি ভাবে কথা শুরু করব বুঝতে পারি না।

আলতাদি প্রথম শুরু করে—তোমার টাকা আমার সম্মান বাঁচিয়েছে। আমি চিরকাল তোমার কাছে ঋণী থেকে গেলাম। এ ঋণ শোধ করা যায় না।

সুন্দর গুছিয়ে কথা বলছে বটে। আমি এই শব্দ চয়নের কৌশল দেখতে এখানে ছুটে আসি নি। আমি আরও কিছু চাই।

বলি—তিন দিন আগে এসে দেখলাম তালা বন্ধ। অথচ যেন তুমি এসে গিয়েছ।

—তুমি এসেছিলে ? কখন ?

—এই সময়েই প্রায়। ঘড়ি দেখি নি। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

—আমি তখন ছিলাম না।

—কোথায় গিয়েছিলে ?

আমার প্রশ্নের ভেতর দিয়ে কি রূঢ়তা ঝরে পড়ল ? আলতাদি হঠাৎ অমন মুখ তুলে চাইল কেন ?

তারপরই মুখ নামিয়ে নিচু স্বরে বলে— একটা কাজের সন্ধানে।

—পেয়েছো ?

—পাই নি। একজন আশা দিয়েছেন। ওপর মহলে তাঁর প্রতিপত্তি আছে।

আলতাদির স্বাভাবিকতা এতটুকুও নেই। তার কথা চাপা চাপা। তার মনও চাপা। সে কলের পুতুলের মতো কথা বলছে যেন। এই কৃত্রিমতা আমার কাছে অসহনীয় বলে মনে হয়।

তবু বলি—আমি একটা ব্যবস্থা করেছিলাম। তুমি সিনেমায় নামতে চাও আগে জানতাম না। জানতে পেরে এখানে একজন ডিরেকটারের সঙ্গে কথা বলেছি। তোমার মোটামুটি কোয়ালিটি থাকলে তিনি চান্স দেবেন কথা দিয়েছেন। কিন্তু সময় বড় কম। কাল পরশু দেখা করলে ভালো হয়। তুমি যাবে ?

আলতাদির দৃষ্টির অতলান্ত ঠাহর করতে পারি না। কী শান্ত সেই দৃষ্টি —কী উদাস।

সে বলে—তুমি আমাকে সিনেমায় নামতে বল ?

—কখনো না। তুমি নিজে নামতে গিয়েছিলে। বিপদে পড়েছিলে। এখানে বিপদ নেই। আমার জানা-শোনা।

—আমি সিনেমায় নামতে চাই না।

মনে মনে নিষ্কৃতি পেলাম। একটা ভারী বোঝা নেমে গেল।

বলি—কিভাবে চলবে তবে ?
—দেখি। আমার অহমিকা চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বাবার ওপর নির্ভর করতে হবে কিছু দিন।
—সেই ভালো। পরে সুদিন এলে শোধ করে দিও। এ-ব্যবস্থা আগে করলে কত ভালো হতো বলো তো ?
কথা বলতে আমার কান্না পায় যেন। সেই আলতাদি আর নেই যার কাছে নিশ্চিন্তে অনেক কিছু বলা যায়। যার কাছে কিছু না বলেও চুপচাপ বসে থেকে শান্তি পাওয়া যায়। আলতাদি এখন অনেক দূরের কেউ। তাই একবারও তাকে আগের মতো ডাকতে পারলাম না। সে-ও আমার নাম ধরে ডাকল না এ-পর্যন্ত।
আলতাদি তার খাটের পাশের একটা আলমারী খোলে। ছোট্ট বাক্স বার করে তার ভেতর থেকে এক ছড়া সোনার হার তুলে নেয় হাতে। সেটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—এটি তোমায় নিতে হবে।
—কেন ? এটি বেচবে কেন শুধু শুধু ? সোনা বেচতে নেই। তোমার কাছে টাকা নেই ? কত দরকার বল ?
এবার আলতাদি ম্লান হাসে। বলে—তোমার কারখানা ভালো চলছে শুনেছি। খুব আনন্দ হলো। আরও বড় হওয়া চাই। আসল কটন্ মিল করতে হবে। তুমি ঠিক পারবে।
—ও হার আমি বেচতে পারব না।
—বেচতে বলছি না। ইচ্ছে করলে রেখে দিতে পারো।
—আমি ? আমি রাখব কেন ?
—তোমার টাকা শোধ দেবার অন্য উপায় নেই।
আমি উঠে দাঁড়াই। জীবনে প্রথম আলতাদিকে চড়া গলায় বলে উঠি, 'অন্য উপায় নেই ? থাকবে কেন ? তুমি আমার মতো ভেড়া নও তাই অন্য উপায় দেখতে পাচ্ছো না। তুমি যে অনেক বেশী বুদ্ধিমতী।
আমি ঘর ছেড়ে চলে আসার আগেই আলতাদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে—ভুল বুঝো না দীপ্তেন দা। আমি বিবেকের কাছে কোনো

অন্যায় করি নি।
—তা করবে কেন? যত অন্যায় করেছি আমি। তোমাকে আমি চিনতে পারলাম। সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলে। তাই এত-দিন পরে দীপ্তেন দা হয়ে গেলাম।
—না। এতদিন পরে সংশোধন করে নিলাম। এতদিন ধরে অন্যায় করে এসেছি। তুমি আমাকে নীলা বলে চিনে রাখো।
—পারব না চিনতে। কিছু বলেই চিনতে চাই না। আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি। ভালোই আছি। কোথাকার নীলা, আছে কি নেই, আমার তাতে কি?
আলতাদি কেঁদে ফেলে। আমার বুক ভেঙে যায়। তবু কিছু বলার নেই।
—দীপ্তেন দা। তোমার মতো মানুষ খুব দুর্লভ। সুচরিতা তোমাকে চিনতে পারলে সুখী হবে।
—সুচরিতা? আমাকে চিনে তার লাভ?
—আমি সব শুনেছি দীপ্তেন দা। সুচরিতা সব বলেছে। তার কাছেই তোমার ব্যবসার খবর পেলাম।
—কি বলেছে সে?
—খারাপ কিছু বলে নি। খুব ভালো বলেছে।
—কি বলেছে বল না।
—সব কথা কি শুনতে আছে? ছেলেদের শুনতে নেই।
—ও। এর মধ্যে ছেলে মেয়েও ভেদাভেদ হয়ে গেল?
—সে তে চিরকালই আছে। আমার একটা অনুরোধ রাখবে?
—কি?
—তোমাকে যে চিঠি দিয়েছি সেটা ছিঁড়ে ফেলো।
—না। ছিঁড়ব না। আর কিছু অনুরোধ করবে?
—ছিঁড়ে ফেললে ভালো করবে।
—কেন? তার মধ্যে তোমার কোনো দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে কি।

আলতাদি আমার কথায় ভীষণ আঘাত পায়। এই আঘাতের প্রতি-ক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার মুখে। সে অনেকটা সময় নেয় সামলে উঠতে।

শেষ পর্যন্ত আস্তে আস্তে বলে—আমার প্রার্থনা, ওটা নষ্ট করে ফেলো।

—ভেবে দেখব। আমি চলি। আমি থাকায় তোমার খুবই অস্বস্তি হচ্ছে লক্ষ্য করছি। আমি চলে গেলে তুমি হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচবে। নিশ্চিন্ত হবে।

আলতাদি দরজা অবধি এগিয়ে এসে শুধু বলে—আমার একটি অস্বস্তিই রইল। তুমি একবারও আমার নাম ধরে ডাকলে না। যত অন্যায়ই করে থাকি, এক মুহূর্তের জন্যেও তোমার অমঙ্গল চাই নি।

—ডাকতে পারি। হাজার বার, কোটিবার ডাকতে পারি। কিন্তু নীলা বলে নয়। আলতাদি বলেও নয়। শুধু আলতা বলে—আলতা—আলতা আলতা। ডাকতে দেবে তুমি? হবে না জানি। আগে বললে হতো কিনা জানি না। কিন্তু এখন হবে না। এখন তুমি অনেক দূরের।

আলতাদি থরথর করে কেঁপে ওঠে। তারপর দরজার কপাট ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

সেই অবস্থায় তাকে ফেলে রেখে আমি তর্‌তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে জনক রোড়ের রাস্তা ধরে গট্ গট্ করে চলতে থাকি।

বড় অস্বস্তিতে দুটো দিন কাটল। মনে শান্তি নেই। কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। মস্ত ভুল। আমিই দায়ী সেইজন্যে। মনে মনে ভাবি, আবার যাবো আজ আলতাদির কাছে। গিয়ে বলবো, তুমি আমাকে শুধু আলতাদি বলে ডাকতে অনুমতি দাও। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। শুধু তুমি আগের মতো হাসো আর গল্প করো। সেটুকুই যথেষ্ট।

সেদিন সকালের দিকেই সুচরিতা এসে হাজির হলো কারখানায়। আমি বিরক্ত বোধ করলাম। এ-সময়ে কারখানার কাজের চাপ থাকে বড্ড বেশী। বাইরের লোকজনও যাতায়াত করে বেশী। চিঠিপত্র দেখা, উত্তর

দেওয়া। ডাক পাঠানো। মাল প্যাক করা।

সুচরিতার আক্কেল বলে কোনো পদার্থ নেই। এ সকতার জানা উচিত। তাছাড়া সেদিন আলতাদির কাছ থেকে আসা অবধি মনও বড় খারাপ। বহুদিন ধরে যত্নে রাখা কোনো জিনিষ হঠাৎ খোয়া গেলে মনের যে অবস্থা হয়, এ তার চেয়েও শতগুণ বেশী।

সুচরিতা এসেই প্রশ্ন করে—কেমন মনে হলো? দুদিন আসতে পারি নি। কথা বলার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। তবু মনের ঝাল মেটাবার জন্যে বলি—তোমার নীলার কথা জানতে চাইছ? সে নিজের পায়ে বেশ দাঁড়িয়েছে।

সুচরিতা আমার কথার মর্মার্থ ঠিক ধরতে পারে না। প্রশ্ন করে—আমি যা বলেছিলাম সত্যি কিনা।

—একেবারে সত্যি। হুবহু সত্যি। এত সত্যি কথা তুমি বলতে পার কল্পনা করি নি।

সুচরিতার মুখে হাসি ফোটে। বলে—এতদিনে তাহলে চিনলে। যাক্, তোমাকে রক্ষা করতে পেরে আমি তৃপ্তি পেলাম।

—তুমি বরাবরই এ রকম পরোপকারী নাকি?

—এ কথা বলছো কেন?

—আর একবার আমার উপকার করেছিলে মনে পড়ে।

—আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—খুব সোজা। এতে কোনো উদ্দেশ্য লুকোনো নেই। শুনলাম তুমি ওর কাছে আমার ভূয়সী প্রশংসা করে এসেছো?

সুচরিতা তার ঠোঁট কামড়ে ধরে। চোখ দুটোয় সন্দেহের ছায়া নেমে আসে। শেষে বলে—কী বলেছে নীলা? নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে বানিয়ে যাতা লাগিয়েছে তোমার কাছে। সব মিথ্যে। একটুও বিশ্বাস করো না।

—সে খারাপ কিছু বলে নি। তোমার বিরুদ্ধে একটি কথাও নয়।

—ও সব পারে। মন ভাঙিয়ে দিতে ও ওস্তাদ।

—সেই রকমই মনে হলো বটে।

— হলেই বাঁচি।

—এবারে তুমি তা হলে এসো। আমার যথেষ্ট কাজ আছে।

সুচরিতা হয়ত আরও কিছুক্ষণ থাকার চেষ্টা করত। কিন্তু সেই সময় একটা প্রাইভেট কার এসে থামল আমার গেটের সামনে। তাই দেখে সুচরিতা অফিস ঘর ছেড়ে গেটের দিকে এগিয়ে যায়।

প্রাইভেট কারটি আমার পরিচিত। দিগম্বর এসেছে। সে নিজেই ড্রাইভ করে এসেছে। আমি লক্ষ্য করি সে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের ওপর হাত রেখে সুচরিতার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। সুচরিতা তাকে দেখে মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

এরপর এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি অবাক হলাম। দিগম্বর হাসতে হাসতে হাতছানি দিয়ে সুচরিতাকে ডাকে। সুচরিতা একবার পেছন ফিরে আমার জানলার দিকে তাকায়। ওখান থেকে আমাকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

সুচরিতা দিগম্বরের গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলে। দিগম্বর দেখি খুব হাসছে। বুঝলাম ওরা পরস্পরের বেশ পরিচিত।

দিগম্বর হাসতে হাসতে আমার অফিসের দিকে এগিয়ে আসে। ঘরে ঢুকেই তার প্রথম প্রশ্ন—এই কি তোর সেই বপ্নের নায়িকা? এরই জন্যে তোর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না?

—না তো? এ হবে কেন?

—তবু ভালো। আমার তো ভাবনা শুরু হয়েছিল?

—তোর সঙ্গে পরিচয় আছে দেখলাম।

—হ্যাঁ পরিচয় আছে। তবে ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করেছিল ওর বড় বোন সুস্মিত্রা। সুবিধে করতে পারে নি।

—তার মানে?

—মানে খুব সহজ। শাঁসালো তরুণ দেখে মোহ-জাল বিস্তারের চেষ্টা আর কি?

—সুচরিতারও সেই অভ্যাস আছে না কি ?

—শুনেছি আছে। সুমিত্রারই বোন তো। তবে কোনোরকম দৃষ্টান্ত দেখাতে পারব না। শুধু শুধু একজনের চরিত্র সম্বন্ধে বলা উচিত নয়। বিশেষ করে সে যখন নারী।

—ওরে বাপ্‌স্‌। তুই দেখছি নারী-কল্যাণের ধ্বজাধারী।

দিগম্বর মিটিমিটি হাসতে থাকে। ওর হাসি বড় বেশী অর্থবহ বলে মনে হয়। আমি অস্বস্তি অনুভব করতে থাকি।

শেষে অসহ্য হয়ে উঠলে বলে ফেলি—সুস্মিতা কেমন করে ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করেছিল তোর সঙ্গে ? বলিস নি তো কোনোদিন।

—বলব কেন ? সে আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারে নি। আমার বাড়ি অবধি ধাওয়া করেছিল। দারোয়ান ঢুকতে দেয় নি।

—একজন তরুণীর পক্ষে এই ধরনের চেষ্টাকে অন্যায় বলা যায় না। এখন তো অহরহ ঘটছে। পাত্র হিসাবে তুই ক্লাস ওয়ান। সুস্মিতার দোষ কি ?

—দোষ কিছু হতো না, যদি এটাই একমাত্র প্রচেষ্টা হতো। সুস্মিতার জীবনে আমি কতো নম্বর তা জানি না।

—তুই বলতে চাস্‌ এটাই তার পেশা ? অর্থাৎ—

—অতটা বলতে চাই না। আমি কখনো চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করি না কারও সম্বন্ধে।

—সেটাই ভালো। আমি ভাবছিলাম, সুস্মিতা আর সুচরিতার মতো আধুনিক মেয়েরা ভাবাবেগে চলে না। ওরা সংসারে স্থিতি চায়। এক-জনকে অবলম্বন করতেই হবে সেজন্যে। সেই চেষ্টায় যতবার চোট খাবে নম্বর ততই বাড়বে। তুই যদি পাঁচ নম্বর হোস্‌, তাহলে বুঝতে হবে তুই যেমন প্রত্যাখ্যান করেছিস, তার আগে আরও চারবার সেই একই রকমের ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে সে। আমি এইটুকু বুঝলাম, ওদের নির্বাচন উঁচুদরের।

—সর্বনাশ। সুচরিতা দেখছি এর মধ্যেই তোকে আধ্যেক গিলে ফেলেছে। কোথায় গেল তোর সেই বপ্নের নায়িকা ?

—ভয় নেই স্ফুরিতা আমাকে গিলতে পারবে না।

—বিশ্বাস নেই? তোর ধমনীতে আমার মতো ব্যবসায়ীর রক্ত বয়ে যাচ্ছে না। তোরা হলি উঠতি বিজিনেস-ম্যান। একটু উত্তাপেই গলে যাবার সম্ভাবনা।

—না ভাই। আমার মন ফ্রিজিং পয়েন্টের অনেক নিচে।

এবারে দিগম্বর একটু সময় নীরবতা পালন করে। তারপর বেশ গম্ভীর ভাবেই বলে—শোন্ দীপু। সুচরিতাকে বেশী আস্কারা দিস্ না।

—আস্কারা আমি দিই না। কিন্তু সে যদি আসে, আমি কি করে তাড়িয়ে দেব? তোর মতো সামনে দারোয়ান রাখতে পারব না, রুচিতে আমার বাঁধবে।

—রাস্তায় কেউ যদি তোকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করে, তাহলে আত্ম-রক্ষার জন্যে রুচি-অরুচির কথা ভাববি?

—সেটা অন্য জিনিষ।

—না। এদের আক্রমণ আরও সাংঘাতিক।

—তুই বলছিস কি দিগম্বর?

—আমি এদের পরিবারের খবর রাখি।

কৌতুহলান্বিত হয়ে প্রশ্ন করি।

দিগম্বর বলে—ওদের বাবা এককালে পাইলট ছিলেন। দেশ বিদেশে যাওয়া-আসা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক। খুবই স্বাভাবিক। পয়সাও ছিল অঢেল। জীবনটা ভালভাবে উপভোগ করে নেবার জন্যে বিয়ে থা করলেন না। বেশ চলছিল। বয়সও বাড়ছিল। হঠাৎ তাঁর জীবনে এলেন এক নারী। তার মানে বুঝছিস? আগেকার দিনে নারী বলতে বুড়োরা বুঝত অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নারী। অনুরূপা দেবীর নাম শুনেছিস তো?

—হ্যাঁ রে বাবা। বল্ এখন।

—অত মাথা গরম করছিস কেন? অনুরূপা দেবী আর নিরুপমা দেবীকে কেউই চেনে না আজকাল। তুই একজন একসেপ্‌সান্। অনুরূপা দেবীর

নারীরা কেমন ছিল ?

আমি চটে-মটে বলি —কল্যাণময়ী, স্নেহাতুরা, সতী, বুক-ভরা মধু, সমর্পিত প্রাণা, সেবা-পরায়ণা –

—থাম্ থাম্। যথেষ্ট হয়েছে। আচ্ছা, এবারে বল তো, আজকাল নারী বলতে ছেলে-ছোকরারা কি বোঝে ?

—উঃ, সুচরিতার বংশ পরিচয় শুনতে, এতো প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, জানলে শুনতেই চাইতাম না।

—ঠিক আছে বলতে হবে না তোকে।

—না না শোন্। নারী বলতে আজকালকার ছেলে-ছোকরারা কয়েকজন ঔপন্যাসিকের নায়িকার মতো ভাবে। লেখকদের নাম করা উচিত হবে ?

—কখনই না। লেখকরা না মরলে তাঁদের রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় স্থান পায় না। তেমনি কোনো ব্যাপারেই তাঁদের নাম উল্লেখ করা উচিত নয়। তবে তাঁদের নায়িকার চারিত্রিক বিশেষত্বগুলো বলতে পারিস।

—হাস্যময়ী লাস্যময়ী বিয়ে করে স্বামীকে নিয়ে কেটে পড়া। তারপর স্বামীর মাথায় কাঁঠাল ভাঙা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিচারিনী আর স্বাভাবিক হোক আর অস্বাভাবিক হোক কামনা বহ্নিতে দাহ্যময়ী।

—মোটামুটি বলেছিস ঠিক। এবারে শোন্। পাইলট মহাশয়ের জীবনে আবির্ভূতা হলেন বেঁচে-থাকা সাহিত্যিককুলের সৃষ্ট এক নারী। তিনিও একই লাইনের। অর্থাৎ এক সময়ে এয়ার হোস্টেস ছিলেন। চাকরি খুইয়ে বসেছিলেন এক কেচ্ছা সংক্রান্ত ব্যাপারে। বিদেশের দুই অতি-বিখ্যাত খেলোয়াড় যাত্রীর সঙ্গে নোংরা ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ভদ্রমহিলা মহা বিপদে পড়ে কিছুদিন নতুন চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর হতাশ হয়ে পাইলট মহাশয়ের শরণাপন্ন হলেন। আর তিনিও নবোদ্যমে ভদ্র মহিলার উপকার করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন বয়সটা তাঁর ইতি-

মধ্যে কিছুটা বেড়ে গিয়েছে। এয়ার-হোস্টেসের ট্রেনিং নেওয়া সেবার কৌশল তাঁর অগোছাল জীবনে একটা নিশ্চিন্তের ভাব এনে ছিল। ফলে, খুব কম সময়ের মধ্যেই তাঁর পরোপকারের স্পৃহা একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গেল। আর এয়ার-হোস্টেস তাঁর সংসারে পাকাপোক্ত আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন।

দিগম্বর চিরকালই রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতে ওস্তাদ। এই জন্যে তার বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা একঘেয়েমী এসে যায়। তবু শুনতে মন্দ লাগে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার বিস্ময় বাড়তে থাকে। অনুমান করে নিতে এতটুকুও অসুবিধা হয় না, সুস্মিতা এবং সুচরিতা কার গর্ভের সন্তান। তাই ব্যগ্রভাবে জানতে চাই—ওঁদের তুজনার বিয়ে হয়েছিল তো ?

—জানি না। অনেকে অনেক কিছু বলে। তবে ওঁরা বলেছেন, কাঠমণ্ডুতে গিয়ে হিন্দুমতে বিয়ে করে এসেছেন। হনুলুলুর কথা বলেন নি।

সুচরিতা সম্বন্ধে আরও বেশী করে জানতে চাওয়ায় দিগম্বর বলে, ওরা তুজনা মায়ের তত্ত্বাবধানে ভালো ট্রেনিং পেয়েছে। ইংলিশ-মিডিয়ামে লেখাপড়া শিখে বেশ চালু। তা ছাড়া ওদের মা নিজের ইনটার ন্যাশনাল-মার্কা গুণাবলী ভালভাবেই ওদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। লোকে বলে, ওরা জীবনের প্রথম বসন্ত আসি-আসি শুরু হতেই চরে বেড়ানো শিখেছে। তুই বোনই এয়ার-হোস্টেস হবার চেষ্টা করেছিল। পারে নি।

আমি মন্তব্য করি—আধুনিক জগতে এ ধরনের জীবন খুব বিরল কি ? তা ছাড়া এতে দোষের কি হলো ?

—তুই খুব উদার দীপু। তোর উদারতার চওড়া কপাট দিয়ে অনেক অবাঞ্ছিত জিনিষ ঢুকে যেতে পারে। সুস্মিতার কাহিনী শোন্ তাহলে বুঝবি। অনেক ঘাটের জল খেয়ে সে এক সিন্ধীকে ধরেছিল বছর খানেক আগে। সেই সিন্ধী সুস্মিতার জীবনের গতি পরিবর্তন করে দেয়।

—কেন, বিয়ে করেছে নাকি ?

দিগম্বর হেসে বলে—না। সিন্ধী লোকটি পৃথিবীর বাজার ঘুরে বেড়ায়।

সব দেশের সুস্মিতাদেরই সে চেনে। আমাদের বাঙালী সুস্মিতা তাকে ধরে ভাবল খুব বাগিয়েছে। তারপর তার সঙ্গে হিল্লি-দিল্লী ঘুরে কয়েক-মাস পরে সে যখন ফিরে এলো তখন তার গর্ভধারিণীও তার চেহারা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন। সেই থেকে মেয়েটি ব্রহ্মচারিণী। একটি নার্শারী স্কুলে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

আমি দিগম্বরের বিবরণ ঠিক যেন উপভোগ করতে পারলাম না। সে হাসছিল। অথচ আমার কষ্ট হচ্ছিল। দিগম্বর ঠিক জানে না জীবন-সংগ্রাম কাকে বলে। ছেলেবেলা থেকে সে দেখে এসেছে তার সামনে পিচ-ঢালা মসৃণ পথ।

আমি বলি—বুঝলাম। কিন্তু সুচরিতার দোষ কি ?

—খবর পেয়েছি, সে-ও ইতিমধ্যে দিদির লাইনে নেমে পড়েছে। তবে দিদির মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তাকে অনেক বেশী সাবধানী করে তুলেছে। অজানার পথে পা বাড়াতে তার দ্বিধা। তাই সে চ্যারিটি বিগিনস এ্যাট হোম—এই কথাটা যারপর নাই মেনে চলছে। প্রথমে বোধহয় তার লক্ষ্য ছিল বড় লোকের কুপুত্র অথবা সুপুত্র। সুবিধা হয় নি। এখন দেখে মনে হচ্ছে তার শিকার হলো উঠতি তরুণ—যাদের ভবিষ্যৎ সুবর্ণ-মণ্ডিত হবার সম্ভাবনায় ভরপুর। যেমন তুই।

দিগম্বরের কথার প্রতিবাদ না করলেও, পুরোপুরি মেনে নিতে পারি না। সুচরিতাদের অনেক দোষ থাকতে পারে। কিন্তু দিগম্বর তাদের যে ভাবে আঁকল, তারা তেমন নয়। দিগম্বর বুঝবে না। আমি বুঝি। আমি জানি, সুচরিতা অভিনয় করলেও, সেই অভিনয় প্রাণের তাগিদে। হয়ত অমন অভিনয় পৃথিবীর সব মেয়েকেই কম বেশী করতে হয়। থিয়েটার রোডের নির্জন পার্কের মধ্যেও আমি সুচরিতার চাহনিতে দেখতে পেয়েছি এক প্রচণ্ড অসহায়তা। আলতাদির চোখে অমন ফুটে উঠতে দেখি নি।

মনের মধ্যে কোথায় একটা কাঁটা খচখচ করছিল। বুঝতে পারছিলাম না। আলতাদির কাছে একবার ছুটে যাবার প্রবল বাসনা। অথচ কিসের যেন দ্বিধা। যদি সে আগের দিনের মতো ব্যবহার করে? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে দুজনার মাঝখানে ভদ্রতার প্রাচীর তুলে দিয়ে। সুচরিতা ওকে কি বলেছে জানি না। কিংবা হয়ত সুচরিতা এমন কিছুই বলে নি। বন্বের ধাক্কা তার মনের ভেতরে সব কিছুকে ওলোট-পালট করে দিয়েছে।

তবু পারলাম না। কারখানা থেকে তাড়াতাড়ি বার হয়ে জনক রোডে গিয়ে পৌছোলাম। কিন্তু হতাশ হতে হয়। দরজা বন্ধ।

ফিরে আসার সময় সেই কিশোরীর সঙ্গে দেখা। পাশের স্টেশনারী দোকান থেকে লজেন্স কিনে একটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে চুষতে চুষতে আসছিল। আমাকে দেখে ফিক্ করে হেসে পাশ কাটাতে চায়। আশ্বান্বিত হয়ে তাকে থামিয়ে বলি—চিনতে পেরেছ দেখছি।

—পারব না কেন ?

—আলতাদি কখন বাইরে গেল ?

—ওঁকে আর পাবেন না।

বড় বেশী অর্থ ফুটে উঠল যেন তার কথায়। পাড়াপড়শীর আলোচনা শুনে শুনে পেকে গিয়েছে। মেয়েরা অমন পাকে।

—পাবো না কেন ? বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে নাকি ?

—প্রায়।

—তার মানে ?

—পাশের ফ্ল্যাটে মিমি-কাকীমাকে আলতাদি বলেছেন, এ বাড়িতে নাকি একা একা থাকতে ভয় করে। কোনো এক বন্ধুর বাড়িতে থাকবেন কিছু দিনের জন্য।

—তারপর ?

—তারপরে তো চলেই যাচ্ছেন।

—কোথায় ?

—আপনি জানেন না ?

—না তো ?

—আফ্রিকার কোথায় যেন। সেখানে ইস্কুলের দিদিমণি হবেন।

বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে। মেয়েটির মুখ দেখে মনে হচ্ছে যা শুনেছে হুবহু বলছে।

তবু বলি—তুমি ঠাট্টা করছ নাকি ?

মুখের লজেন্সটা কড়মড় করে চিবিয়ে উত্তেজিত স্বরে সে বলে—ঠাট্টা করব কেন? সত্যি কথা বললাম কিনা, তাই ভালো লাগল না। আর কেউ তো কিছুই বলল না। ওই যে দোকানের কানুদাকে জিজ্ঞেস করুন, বলে দেবে।

কি করব বুঝে উঠতে পারি না। কিশোরীকে বিদায় দিয়ে আলতাদির ফ্ল্যাটে উঠে যাই। মিমি-কাকীমা নিশ্চয়ই পাশে থাকেন। তিনি আর একটু বিস্তারিত ভাবে বলতে পারবেন।

বেল টিপি।

এক ভদ্রমহিলা দরজা খোলেন।

অপ্রস্তুত নমস্কার ঠুকে বলি—দেখুন, কিছু মনে করবেন না—

—নীলার খবর তো ?

বোঝা নেমে যায়। নিশ্চিন্ত হয়ে বলি—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ও, এখানে আপাতত থাকছে না। এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছে। বন্ধুই নিয়ে গিয়েছে সঙ্গে করে।

—কোথায় ?

—ঠিকানাটা জানি না।

—কবে ফিরবে বলেছে ?

—এ বাড়িতে ফিরবে কিনা সন্দেহ। এত ভালো মেয়েটি পাড়ায় এক ডাকে যার এত নাম, হঠাৎ দুর্নামের ভাগী হয়ে গেল। কেউ কথাও বলত না ওর সঙ্গে। থাকতে পারল না তাই চলে গেল।

মনের ক্ষোভ চেপে রেখে বলি—তবু একজনের অন্তত তার ওপর দরদ

ছিল দেখছি।

আমার কথার ধরনে—ভদ্রমহিলা মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি দরজায় কপাট বন্ধ করতে গিয়ে থেমে পড়ে বললেন—দরদ থাকলেও আজকাল অনেক কিছুই করা যায় না। আপনি পারলেন ? দেখে তো মনে হয়, আপনার দরদ সব চাইতে বেশী।

নিজের রূঢ়তায় সংকুচিত ছিলাম। তাড়াতাড়ি বলে ফেলি—আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি কিছু ভেবে বলি নি।

—বুঝেছি। আচ্ছা নমস্কার। ভদ্রমহিলা দরজা বন্ধ করতে যান।

—শুনুন, আর একটু।

—বলুন।

—শুনলাম, ও নাকি কোথায় চলে যাচ্ছে ? সত্যি ?

—চেষ্টা করছে। বোধহয় পেয়ে যাবে।

—কোথায় যাচ্ছে ?

—উগাণ্ডা থেকে টিচার চেয়ে পাঠিয়েছে ভারত সরকারের কাছে।

—ও !

এবারে বুকের মধ্যে কেমন খালি খালি লাগে। আলতাদি চলে যাচ্ছে উগাণ্ডা ? সে তো অনেক দূর।

—আচ্ছা ও চাকরিটা পাবে ?

—তাই তো মনে হচ্ছে। ভালো ব্যাকিং পেয়েছে। ওর আর এক বন্ধুর মামা। চিনবেন বোধহয় ভদ্রলোককে। নিখিলেশ সামন্ত।

—হ্যাঁ, খুব চিনি। আচ্ছা, অশেষ ধন্যবাদ।

ভদ্রমহিলা দরজা বন্ধ করেন। আমার পায়ের জোর সহসা কমে যায়। মনে হয় বসে পড়ি ওখানেই। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এক ধাপ এক ধাপ করে নিচে নামতে থাকি আর মনের আলোগুলো একটা একটা করে নিভতে থাকে।

এখন কোথায় পাবো আলতাদিকে ? নিখিলেশ সামন্তের বাড়ির সন্ধান পেতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তিনি অন্তত জানেন, আলতাদির

সন্ধান। সেখানে যাব।

এলগিন রোডে নিখিলেশ বাবুর বাড়ি। ঠিকানা সংগ্রহ করে উপস্থিত হলাম দুদিন পরে। কিন্তু ব্যর্থ হলাম। তিনি এখন দিল্লীতে। ফিরতে তিন দিন বাকী।

খবরটা যে দিল, সে তাঁরই গৃহভৃত্য। তাকে আলতাদির কথা প্রশ্ন করায় কিছুই বলতে পারল না। বুঝলাম, তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কারণ এ বাড়িতে বহু লোক আসে দেখা করতে। আমি থাকতে থাকতেই জনা কয়েক এলো। কেউ চাকরির জন্যে, কেউ টি. বি. হস-পিটালে একটা ফ্রি বেডের জন্যে। তবে আলতাদি নিখিলেশ বাবুর ভাগনির বন্ধু। সেই হিসাবে চেনার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পারল না।

চলে এলাম। পরে দেখা করব।

আজকাল ট্যাক্সি বাবদ খরচ বেশী হয়ে যাচ্ছে। দিগম্বর এ বিষয়ে আগেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু আমি হিসেব করে দেখেছি, এতে আমার ভয়ের কিছু নেই। আমার ব্যবসা আর দিগম্বর-দের পারিবারিক ব্যবসা এক নয়। সময়কে পেছনে ফেলার চেষ্টা করলে আমার প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায় অনেক ক্ষেত্রে। তাতে অনেক লাভ। শুধু দেখতে হবে, আমার ট্যাক্সি ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত না হয়।

কারখানায় আমার অনুপস্থিতিতে কয়েকদিন হলো অরিন্দম দেখা শোনা করছে। আমারই প্রায় সমবয়সী সে। খবর নিয়ে জেনেছি ছাত্র হিসাবে আমার চেয়ে অনেক কৃতি। বেকার বসে ছিল। আমাদের পাড়ায় এসে রকে বসে আড্ডা জমাতো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। থাকে কালিঘাটে।

ওদের আড্ডাখানার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি কতকগুলো ব্যাপারে ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। প্রথমত, আমি দেখতাম আর সবার মতো ফালতু কথা ও কখনো বলত না। প্রতিটি কথায় যুক্তি থাকত। রাস্তা

দিয়ে মেয়েরা যাবার সময় সবাই সেইদিকে হাঁ করে চেয়ে থাকত। কিন্তু অরিন্দমের মুখ ওদের হালচাল দেখে গম্ভীর হয়ে যেত। স্পষ্টই বোঝা যেত, সে এসব পছন্দ করে না। সবাই বিড়ি সিগারেট টেনে চলত সমানে। ওকে কখনো ধুমপান করতে দেখি নি। অবাক হতাম। ওই মজলিশে আমার বন্ধুও দু'একজন ছিল। তারা জানত আমি আদৌও আড্ডা দিই না। তাই একদিন আমাকে ওদের পাশে বসে পড়তে দেখে ওদের চোখ বড় বড় হয়ে যায়।

মানু নামে ছেলেটি বলে ওঠে—আরে বাপ্‌স্, দীপু তুই বসলি শেষ পর্যন্ত?

—হ্যাঁ ভাই।

—উঠে পড় শিগ্‌গির। চরিত্তির নষ্ট হয়ে যাবে।

—চরিত্র বলে কিছু থাকলে তো?

সুখেন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে—এতদিন কোথায় ছিলি ভাই। আজ আমাদের সেনগুপ্তের রক আলো হয়ে গেল। এর পুরু ধূলিকণা পবিত্র আজ।

মানু চেঁচিয়ে সামনের নন্দর চায়ের দোকানে সাত কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বলে—পয়সাটা আমি দেব।

অরিন্দম আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। সে বলল—আপনি তো একটা কারখানা খুলেছেন, তাই না?

—হ্যাঁ।

—লোন পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কেমন চলছে?

—বেশ ভালো। খাটতে হবে।

—সে তো নিশ্চয়। ব্যবসা মানেই চিরকাল সমান ভাবে পরিশ্রম করে যাওয়া। খুব আনন্দ এতে, তাই না?

—নিজের সৃষ্টিতে কার না আনন্দ হয়?

—ঠিক। আপনাকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করি।
সুখেন বলে ওঠে—তাই নাকি রে? জানতাম না তো? প্রণাম ঠুকে দে
একটা।
অরিন্দমের কানে সেকথা ঢোকে না।
আমি প্রশ্ন করি—আপনি কি করেন?
—কিছুই না। দু'চারজন ছাত্র পড়াই। অনেক কিছুর চেষ্টা করে যাচ্ছি
কিছুই হচ্ছে না।
চা এসে যায়। সবাই খুব আনন্দের সঙ্গে চা-পর্ব সাঙ্গ করে। আজ
একটা উৎসবের দিন। আমি কথা দিই মাঝে মাঝে ওদের আড্ডাখান
আলোকিত করব। আর যাই হোক, মনকে হালকা করার পক্ষে এর
জুড়ি নেই।
অরিন্দম আমার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ে একসময়। আমিও
উঠে বলি—চলুন, একসঙ্গে যাই।
চলতে চলতে প্রশ্ন করি—আপনার পুরো নামটা জানা হয় নি।
—অরিন্দম ঘোষাল।
—কালিঘাটে থাকেন শুনলাম। নিজের বাড়ি?
—না। ভাড়া বাড়ি। ছোটবেলা থেকে। আদি নিবাস পদ্মার তীরে
পাবনা।
তারপর ওর লেখাপড়ার খোঁজ খবর নিই। শেষে বলি—চলুন না
আমার কারখানা দেখে আসবেন।
—এখুনি?
—হ্যাঁ। আমি সেখানেই যাচ্ছি। আপনার অসুবিধা হবে?
—না। রাত্রে দুজন ছাত্র পড়াতে হবে। দুবেলা পড়াই।
—কি রকম হয়?
—দেড় শো। তবু সবসময় নয়।
কারখানা দেখে মুগ্ধ হয় অরবিন্দ ঘোষাল। অনেকক্ষণধরে দেখে।
শেষে বলে—আমি আর একদিন এলে আপনার আপত্তি আছে?

—আপত্তি কিসের? রোজই আসুন না।

—তা তো সম্ভব নয়।

—একটা কথা বলব অরিন্দমবাবু?

—বলুন।

—কিছু মনে করবেন না। খুব সঙ্কোচের সঙ্গেই বলছি। আপাতত যদি কারখানা থেকে দেড়শো টাকা দিই, তাহলে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?

অরিন্দম স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে।

আমি তার হাত ধরে বলি—ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেল বোধহয়! তবু না বলে পারলাম না। আমার একজন সহকারী দরকার। কিন্তু আমার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। কারখানার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমার আর আপনার উন্নতি হবে।

অনেক পরে অরিন্দম উত্তর দিয়েছিল—এ আশাতীত।

—সেকথা বলবেন না। এতে আপনাকে হেয় করা হয়েছে। এ কিছুই নয়। তবু ভাবলাম, আপনার দুজন ছাত্রকে আপনি এখানে কাজে নিলেও পড়াতে পারবেন। অথচ আপনি এলে আমার মস্ত লাভ।

—এতটা বিশ্বাস কি করে হলো? আমার সঙ্গে তো আজই প্রথম পরিচয়?

—আমার ধারণা এটা। নির্ভুল ধারণা।

অরিন্দম একটু হাসে।

সেই থেকে সে দেখা-শোনা করছে আমার অনুপস্থিতিতে। অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সে কাজ করছে। দিগম্বর শুনেছে এর কথা। দেখা হয় নি। কারণ আমি কারখানায় এলেই অরিন্দম মার্কেটে বার হয়ে যায়। সেদিন কারখানায় গিয়ে পৌঁছলে অরিন্দম জানায় যে একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন।

কে এলো? আলতাদি? না না, সে হতে পারে না। সে কেন হতে যাবে? সে তো চলে যাচ্ছে।

অরিন্দম আলতাদি কিংবা সুচরিতা কাউকে দেখে নি। হয়তো সুচরিতার কথা শুনে থাকবে কারখানার অন্যদের কাছে।

আমি বলি—নাম বলেছে ?

—হ্যাঁ। সুচরিতা।

আমার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। বলি—কি—বলল ?

—কিছুই না। বললেন, আবার একদিন আসবেন। খুব দরকার নাকি।

কোনোরকম মন্তব্য করি না। অন্যের সামনে নিজেকে সাধু-মহাপুরুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার ঝোঁক আমার কোনোকালেই নেই।

অরিন্দম বলে--টেলিফোনের জন্যে একটা দরখাস্ত করে দেওয়া দরকার।

—আমাদের ?

—হ্যাঁ।

—প্রচুর খরচ।

—জানি। তবে দরখাস্ত এ্যাপ্রুভ্‌ড্‌ হয়ে টেলিফোন বসতে বসতে অনেক সময় লাগবে। ততদিনে আমরা টেলিফোন বসাবার মতো যোগ্য হয়ে উঠব।

অরিন্দমকে জড়িয়ে ধরে বলি—তুমি থাকবে অরিন্দম ?

--নিশ্চয়।

—তাহলে আমাকেও নাম ধরে ডাক আজ থেকে।

—ঠিক আছে।

—বাঁচলাম। দিগম্বর ছাড়া আশে-পাশে আমার বন্ধু বলতে কেউ নেই।

—কেন মান্তু আর সুখেন ?

—ওরা হলো মজলিশের বন্ধু।

অরিন্দম নিজেই পরের দিন একটা পিটিশান্‌ টাইপ করে এনে আমার সই নেয়।

নিখিলেশ বাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে স্লিপ পাঠিয়েই আমার মধ্যে একটা জড়তা এসে গেল। ভাবলাম কি ভাবে শুরু করব? আলতাদি আমার কে? অথচ সে নিখিলেশবাবুর খুবই পরিচিত। আলতাদি সম্বন্ধে আমার আগ্রহ দেখে তিনি কি মনে করবেন? কিভাবে নেবেন ব্যাপারটা? ভাবতে ভাবতেই গৃহভৃত্য এসে বলল—আপনি চলুন।

ভেতরে গিয়ে নমস্কার করলাম। সুন্দর একটি ঘর। ঠিক অফিসের মতো সাজানো-গোছানো। তিনি বিরাট একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পেছনে উঁচু রকিং চেয়ারে বসে বসে হেলছেন দুলছেন ঘুরছেন। আমাকে দেখেই থেমে গিয়ে হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে বলেন—বসুন।

আমি বসি। ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাই। তাঁকে মিটিং-এ দেখেছি। তখন এক রূপ। এ্যাসেম্বলিতে দেখেছি আর এক রূপে। আজকাল লোকসভার কেমন রূপ জানি না। কারণ কাগজে তাঁর লোকসভার ভাষণ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। অথচ সাধারণ লোকে প্রত্যাশা করেছিল ভারতবর্ষ না হোক পশ্চিম বাঙলার সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর অন্তত শোনা যাবে। হয়তো তিনি রাজনীতি খুব বেশী বুঝে গিয়েছেন। তাই নীরব হয়ে গিয়েছেন। শূন্য কলসীর আওয়াজ বেশী।

আজ তাঁর ঘরে খুব কাছ থেকে দেখে মনে হলো, ভদ্রলোকের ভেতরের আগুণ একেবারে নিভে গিয়েছে। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত জয়ী হয়ে বুঝে ফেলেছেন, তিনিই মুখ্য, নির্বাচকরা গৌণ।

—বলুন, আপনার বক্তব্য। আপনাকে কখনো দেখি নি তো?

—না। আজই প্রথম এলাম। আমি আপনাকে অনেক দেখেছি।

—বলুন।

—আমি এসেছি একটু স্বতন্ত্র সমস্যা নিয়ে। নীলা নামে মেয়েটি আপনার ভাগিনেয়ীর বান্ধবী।

ভদ্রলোকের চোখে এতটকুও কৌতহল ফুটে উঠল না। বলেন—হ্যাঁ। বলুন।

—আপনি কি তার চাকরি করে দিচ্ছেন উগাণ্ডায়?

—একথা জানতে চান কেন ? আপনি কে ?
—আমি তার খুবই পরিচিত। একান্ত হিতৈষী।
—খুব ভালো। হ্যাঁ, সে পেয়ে যাবে চাকরিটা কয়েক মাসের মধ্যে।
—ওটা ওকে দেবেন না।
—তার মানে ?
—আপনি কলকাতাতেই ওকে একটা চাকরি করে দিন।
—সে এখানে থাকতে চায় না।
—জানি। খুব স্বাভাবিক। প্রচুর আঘাত পেয়েছে। তবু আমার প্রার্থনা এটি।
—অসম্ভব। তার প্রার্থনার মূল্য আমার কাছে আরও অনেক বেশী। আপনি এখন যেতে পারেন।
—আমার আর একটা অনুরোধ আছে।
—কি ?
—নীলা, তার নিজের বাড়ি ছেড়ে এসেছে অনেক দুঃখে। আমি সে সময়ে ওখানে ছিলাম না। থাকলে কোনো রকম ব্যবস্থা করতে পারতাম। আপনি অনুগ্রহ করে বলে দিন, সে কোথায় আছে।
ভদ্রলোকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে বলে মনে হয়। ওঁর গৌরবর্ণ মুখখানা লাল হয়ে ওঠে, বলেন—আমি জানি না সে কোথায় আছে। জানলেও বলতাম না। সে যদি সত্যিই আপনাকে হিতৈষী বলে ভেবে থাকে, তাহলে নিজে থেকে যোগাযোগ করবে।
আমি উঠে নমস্কার জানাই।
ভদ্রলোক প্রতি নমস্কার করার মতো যোগ্য বলে ভাবেন না আমাকে। বার হয়ে আসি।
আলতাদির বর্তমান ঠিকানা জানা এখন অসম্ভব আমার পক্ষে। পথে-ঘাটে দৈবাৎ দেখা হয়ে যাওয়া অন্য কথা। তাও হবে বলে মনে হয় না। সে জানে, আমার দৈনিকের রুটিন। সেই অনুযায়ী এড়িয়ে চলবে আমাকে। কিন্তু কেন ? বম্বের ঘটনা তার এতটা পরিবর্তন ঘটালো

কেন ? সেদিন প্রচণ্ড অভিমানের বশবর্তী হয়ে আমি কিছুই শুনতে চাই নি। আমার আরও সংযত আরও সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত

সুচরিতা কদিন পরে কারখানায় এলো।

তার আবির্ভাবে আগের সেই চঞ্চলতা নেই। একটু যেন সঙ্কুচিত ভাব। ও বোধহয় অনুমান করে নিয়েছে দিগম্বর আমাকে ওদের সব কিছু বলে দিয়েছে। বেচারা!

ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলি—বসো সুচরিতা।

—তবু ভালো। আমি ভাবলাম হয়তো তাড়িয়ে দেবে।

—কেন ? অপরাধ করেছ কিছু ?

—না। অপরাধ না করলেও অনেক সময় অনেক কিছু রটে।

সুচরিতার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলি—যেমন আলতাদি সম্বন্ধে রটেছে।

ও আমার দৃষ্টি সইতে না পেরে মাথা নিচু করে। আস্তে-আস্তে বলে—ওটা রটনা নয়। অনেক প্রমাণ আছে।

—বম্বেতে ফাস্ট লাইফ লীড করা—কুৎসিত ব্যারাম—সব ?

—জানি না। তুমি আমার ওপর খড়্গহস্ত কেন আজ ?

—না তো ?

—আমি জানি।

—কি ?

—সেদিন কারখানা থেকে বার হবার সময় দিগম্বরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি কিছু বলে থাকবেন।

—কি বলবেন ?

—আমাদের সম্বন্ধে কোনো কথা। উনি কি তোমার পরিচিত ?

—এই জায়গাটা তাঁরই। আমাকে ভাড়া দিয়েছেন।

—সম্বন্ধটা ওইটুকুতেই সীমাবদ্ধ রেখো।
—কেন ? ওকথা বললে কেন ? লোকটা খারাপ নাকি ?
—বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। তোমাকে উনি কি বলেছেন তাও জানি না। আমাদের অপদস্থ করার জন্যে অনেক কিছুই বলতে পারেন। ওঁর সুবিধে উনি পুরুষ আর আমরা নারী। ওঁদের গায়ে কাদা লাগে না। আর কাদা আমাদের গায়ে লাগলে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।
—এ সব বলছ কেন সুচরিতা। দিগম্বর এমন কিছুই বলেনি।
—বিশ্বাস করি না। ও ধরনের মানুষ অসহায় তরুণীদেরও সর্বনাশ করতে পারে হাসতে হাসতে।
—কেন ? কি করেছে সে ?
—সত্যিই কিছু বলে নি ?
—শুধু বলেছে, তোমার দিদির কথা। সুস্মিতা তার নাম।
সুচরিতার মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে। বলে—সুস্মিতা তার নাম ? এইটুকু ? আমাকে তুমি কি ভাব দীপ্তেন ?
হেসে বলি—ভাবি, তোমার বড্ড বেশী রাগ আর সন্দেহ বাতিক।
চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে সে বলে—রাগ ? সন্দেহ বাতিক ? ও দিদির কি করেছে জানো ? অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। নিজে নয়, দারোয়ান লেলিয়ে। অথচ প্রথম ইঙ্গিত ওর দিক থেকেই এসেছিল। দিদি ভুলেছিল, এই তার দোষ।
—তোমার দিদি কি করে ?
—কিছুই নয় বলতে গেলে।
—বিয়ে হয় নি ?
—না, বিয়ে আর করবে না।
আমি দিগম্বরকে অবিশ্বাস করি না। বুঝতে পারি, সুচরিতা অনেক কিছুই চেপে যাচ্ছে। না চেপে উপায় কি ? তবু সুস্মিতার দোষ আমার কাছে প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে না।

—বসো সুচরিতা। ও সব কথা থাক।
—তুমি দিগম্বরের সংস্পর্শ ছাড়ো।
—আমি যে ওঁর ভাড়াটে।
অরিন্দম বাইরে গিয়েছিল। ফিরে আসে। সুচরিতাকে দেখতে পেয়ে ভেতরে আসতে দ্বিধা বোধ করে।
—এসো অরিন্দম। কি খবর?
—মনোহর লালের সঙ্গে বন্দোবস্ত পাকা করে এলাম। আগামী মাস থেকে নেবে।
—যাক একটা কাজের কাজ হলো।
—দিগম্বর বাবুর সঙ্গে দেখা হলো রাজা উডমণ্ড স্ট্রীটে। বললেন, একটু পরে আসবেন।
সুচরিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে বলে—আমি তা হলে আসি আজ।
তার অদ্ভুত ব্যবহার অরিন্দমের চোখে লাগে। বুঝতে পারে না কিছু।
আমি বলি—একটু বসো সুচরিতা।
—না। আজ কাজ আছে।
অরিন্দম চলে যায় বাইরে।
সুচরিতা রেগে বলে—লোকটা তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে।
হেসে বলি—তাই দেখছি।
সুচরিতা জানে না, দিগম্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শৈশব থেকে। আমাদের দুজনার বাবাও পরস্পরকে চিনতেন। একথা ওকে জানালে দারুণ আঘাত পাবে। আমার জীবন থেকে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু এখনি তা আমি চাই না। আলতাদির ঠিকানা ও জানতে পারে। আলতাদির বন্ধু সুচরিতারও বন্ধু হতে পারে।
সুচরিতা রওনা হলে, আমি এগিয়ে গিয়ে বলি—বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।
সে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে—সত্যি!

—হ্যাঁ। কোথায় দেখা করব। লেকে?

—না। সেই পার্কে।

একটু ভেবে নিয়ে বলি—বেশ। ঠিক সাড়ে ছটায়।

সুচরিতা চলে যায়।

একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সাতটা বাজে। তবু জানতাম সুচ-রিতা আমার জন্যে অন্তত ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করবে। তাগিদ আমার যতটা, তার চেয়ে অনেক-গুণ বেশী তার। দিগম্বর আমার কাছে কত টুকু ভেঙেছে সেকথা জানার জন্যে সে অস্থির না হয়ে পারে না।

পার্কের কাছে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই দেখি ত্রস্ত সুচরিতা সভয়ে বার হয়ে আসছে ছুটে।

আমি তার হাত চেপে ধরতেই সে কামড়ে দেয় হাতে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বলি—উঃ, কামড়ে দিলে শেষে সুচরিতা?

সে চকিতে আমার দিকে চেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে—ওরা আমাকে অপমান করতে চেষ্টা করেছিল।

—কারা?

—ওই পার্কের মধ্যে। আমাকে ধরতে ছুটে আসছিল।

—দেখছি না তো।

সত্যিই কাউকে দেখলাম না। রেলিং-এর ওপর দুচার জন বসে ছিল। দেখলে মনে হয়, আশেপাশের বড় বাড়ির দারোয়ান, কিংবা রাস্তার সেলুন, লণ্ড্রীর দোকানের লোকদের কেউ কেউ। ওদের মুখে কোনো-রকম কৌতূহল নেই। নির্লিপ্ত ভাব।

—চল, দেখি পার্কের ভেতরে।

সুচরিতা জোরে আমার হাত চেপে ধরে বলে—না না যেওনা। তিন চারজন আছে। খুব ষণ্ডাগণ্ডা দুধ-ফল খাওয়া চেহারা। তুমি পারবে

না ওদের সঙ্গে।
—আমি দেখব। তুমি চল।
—না। ওরা তোমাকে ছুরি মারতে পারে।
—মারুক। চলই না দেখি। অত ভয় কিসের? যারা মেয়েদের ওপর চড়াও হয়, তারা খুব ভীতু হয়।
সুচরিতা আমার হাত ধরে ভেতরে যেতেই দেখি তিনটি যুবক ছুটে গিয়ে রেলিং টপকে রাস্তার ধারে রাখা একটি প্রাইভেট কারে স্টার্ট দিয়ে হাওয়া হয়ে যায়।
—দেখলে?
সুচরিতা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর আমাকে একটা আলোর সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে—দেখি, তোমার হাত? ইস্, রক্ত জমে গিয়েছে।
—রক্ত বার হয় নি?
—না। কষ্ট হচ্ছে?
—একটু হচ্ছে বৈ কি। তোমাকে খুশী করার জন্যে শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন?
—আমি কি মিথ্যে বলতে বলেছি?
—বল নি বটে। তবে তোমরা অনেক সময় মনের মতন মিথ্যে কথা শুনতে চাও।
—সুচরিতার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বলে—যা, ভয় পেয়েছিলাম।
—আমি না এলে অনেক কিছু ঘটতে পারত।
—কি করে?
—ওই গাড়িতে করে তোমাকে নিয়ে যেত।
—কোথায়?
—সে খবর আমি রাখি না। শুনেছি এমন হয় হামেশা।
সুচরিতাকে বলতে পারি না, কলকাতার ময়দানে গভীর রাতে নির্জন স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রাইভেট গাড়িগুলির মালিকেরা সবাই সারা-

দিনের ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে বসে না, কিংবা স্বর্গীয় প্রেমালাপ করে না। অনেক গাড়ি এই সবের মধ্যে থাকে যেগুলোর স্প্রিং ভাঙা মেঠো রাস্তা পার হতে যেটুকু পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তার চেয়েও অনেক বেশী সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দেয় এই ময়দানে। এই সহিষ্ণুতা জুলুমবাজীর শিকার কোনো অসহায় তরুণীর আর্তনাদে চৌচির হয়ে যাবার সম্ভাবনায় টনটন করতে থাকে কত সময়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন হয় না। চোখ কান খুলে রাখলে, স্বাধীন দেশের পার-ক্যাপিটা ইন্‌কাম বৃদ্ধির সহায়ক যে সমস্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি, তাঁদের মাতৃ-ভাষা-ভুলে-যাওয়া বীর পুত্রেরা মেট্রো সিনেমা থেকে শুরু করে চৌরঙ্গী ধরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড অবধি একবার গাড়ি চালিয়ে গেলে অনেক উর্বশীর দর্শন পায়। সেই উর্বশীরা আসে শহরতলি থেকে। তাদের মুখে পাউডারের প্রলেপ। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, অথচ জিরজিরে স্বাস্থ্য। আসার সময় অসুস্থ ছোট ভাইকে কিংবা বৃদ্ধ মা বাবাকে কত জিনিষ নিয়ে যাবার আশ্বাস দিয়ে আসে। কোনোদিন সেই আশ্বাস ফলবতী হয়, কোনোদিন হয় না। এরা সুচরিতার মতো নয়। তার চেয়েও এরা অনেক বেশী প্রগতিশীল। এদের ভাইবোনেরা না জানলেও, মা-বাবারা জানে। অফিসে কাজ করতে যাচ্ছি বলে চলে গেলেও, আসলে এরা কোনো অফিসে কাজ করে না। সেটা মেনে নিয়েছে তারা। সমাজের ভাঙ-চুর হচ্ছে দিনে দিনে। এরা তার অগ্রদূত। এদের অস্থি-মজ্জা আর রক্তে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠবে সেখানে পার-ক্যাপিটা ইনকামের হিসাব বার করতে স্ট্যাটিসটিক্‌স্‌-এর প্রয়োজন হবে না।

আমি বলতে পারি না সুচরিতাকে, যে তিনজন আজ তার ওপর চড়াও হয়েছিল, তারা হয়তো একটু ভুল করে ফেলেছিল। তারা জানত না সুচরিতা ততটা প্রগতিশীল নয়। সে শুধু সামান্য কয়টি টাকার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করার মতো মহৎ হয়ে ওঠে নি। তার দাবী আরও বড়। সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে চায়।

সুচরিতা বলে—তুমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে কেন ? পেশী যন্ত্রণা হচ্ছে ?

—না। ভাবছি চোদ্দটা ইনজেকসান্ দিতে ট্রপিকালে যেতে হবে কিনা।

—কেন ? আমি কি কুকুর !

—ছি ! ও কথা মুখে আনতে হয় ? কিন্তু তুমি পাগল কিনা জানতে হবে ?

—ঠাট্টা করো না। আমার বুক এখনো কাঁপছে। চল ডেটল লাগিয়ে নাও, কোনো ডিসপেন্সারী থেকে।

—এই না বললে, রক্ত বার হয় নি।

—বলছি তো। বিশ্বাস না হয় নিজেই দেখ।

—তবে আর দরকার নেই। কোথায় বসবে ?

—বসব না। হাঁটতে হাঁটতে যাব।

—কোন্ দিকে ?

—পার্ক স্ট্রীটের দিকেই ভালো। বড় বড় বাড়ি উঠে থিয়েটার রোড নষ্ট হয়ে গেল।

—শেক্সপীয়র সরণীতে বড় বাড়ি মানাবে ভালো।

—একটা উৎকট সভ্যতা কলকাতাকে গ্রাস করছে।

—কথাটা মন্দ বল নি। এর কারণ হলো বাঙলার সংস্কৃতি কলকাতায় কোণ ঠাঁসা হয়ে পড়েছে।

—ঠিক। তুমি এ ব্যাপারে চিন্তা কর দেখছি।

—আমিও সেই কথাই ভাবছি।

—কি ?

—তুমি এ ব্যাপারে চিন্তা কর। তাও আবার ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া মেয়ে হয়ে।

আমি, সুচরিতার মায়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ঠিক সময় মতো সামলে নিই। কাটাকাটি কাণ্ড হয়ে যেত তাহলে। সুচরিতা হাসে। প্রশ্ন করি—হাসছ যে ?

—এমনিতে।

—এম্‌নিতে কেউ হাসে না। তুমি যদি সত্যিই এম্‌নিতে হাসো, তাহলে কালকে ট্রপিক্যালে যেতে হবে।
—গিয়েও লাভ নেই। খ্যাপা মানুষ কামড়ালে তার ভ্যাক্‌সিন নেই সম্ভবত।
আলতাদির প্রসঙ্গ কিভাবে তুলবো ভেবে পাই না। সে যদি সত্যিই উগাণ্ডায় চলে যায়?
সুচরিতা বলে—দিগম্বর অমানুষ। ওর সঙ্গে বেশী মেলামেশা করো না দীপ্তেন।
—তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।
—ও তোমাকে আর কি বলেছে, বলবে না?
—কিছুই না।
—ঠিক বলছ?
—হ্যাঁ।
—আমাকে ছুঁয়ে বলতে পার?
—তোমাকে ছুঁয়ে যদি মিথ্যে কথা বলি, তাহলে কি হবে?
—ঠিক জানি না। বোধহয় আমি মরে যাব।
—তোমার ওপর যদি আমার কিছুমাত্র টান না থাকে, তাহলে তুমি মরে গেলেই বা আমার কি? আর টান থাকলে ধাপ্পা দিতে যাব কেন?
—তা বটে। তবু ছুঁয়ে বল। একবার স্পর্শ কর অন্তত। আমি অস্পৃশ্য নই।
—না। ও সব ছেলেমানুষী কিংবা মেয়েমানুষীকে আমি প্রশ্রয় দিই না।
—এত দেমাক?
—দেমাক কোথায় দেখলে? এমনও তো হতে পারে যে তোমার ওপর টান আছে বলেই, তোমাকে স্পর্শ করাটা এড়িয়ে গেলাম। দিগম্বর কিছু বলতেও পারে।
—উঃ! তুমি বড় সাংঘাতিক তো?

—পুরুষদের সাংঘাতিক হওয়াই ভালো। নইলে মেয়েরা নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সাংঘাতিক হয়েও যা অবস্থা নিজের চোখেই তো দেখছ।

সুচরিতা থেমে যায়। পাশেই একটা লাইট পোস্ট। সেই লাইটে তার চোখ দুটো চিক্‌চিক্ করে। সে বলে—আমি চলে যাচ্ছি। তুমিই আজ আমাকে আসতে বলেছিলে।

হাত দুটো জোড় করে বলি—মাফ চাইছি।

—না। ও সব বিদ্রূপ সহ্য হয় না।

—পায়ে ধরব ? সব পারি। আমার নাক-কান কাটা।

—না।

—তবে চল।

—না দীপেন। আমার ভুল হয়েছে তোমার সঙ্গে আসা। তুমি কেমন যেন আল্‌গা আল্‌গা। তোমার কথায় চটক আছে কিন্তু মনের উত্তাপ নেই। আমার সরে যাওয়াই ভালো।

কষ্ট হয়। ঠিক ধরেছে সুচরিতা। তাই কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি না। শেষে একটু হেসে উঠে বলি —এটা তোমার ব্যর্থতা। আলতাদি হলে হয়ত সফল হতো।

ফোঁস করে উঠে ও বলে—উঃ আলতাদি। শুধু রূপ। তোমরা রূপের মধ্যে কী যে দেখতে পাও।

—জানি না। ভগবানকে জিজ্ঞাসা কর। কিন্তু কথাটা ঠিক।

—যতই ঠিক হোক। আশা নেই আর। নীলা এবার তার বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।

বিস্মিত হবার ভান করে বলি—সত্যি ? কবে ? কেন পালালো ?

—কেন পালালো কি করে বলব ? পাড়ায় বোধহয় টিকোতে পারল না।

এইবারে সময় এসেছে। এখন যদি আলতাদির বর্তমান ঠিকানা জেনে নেওয়া যায়।

—আবার বম্বেতে চলে গেল ?

নাক কুঁচকে সুচরিতা বলে—না। ওখানকার ফিল্ড শেষ হয়ে গিয়েছে। অতবড় প্রডিউর্সারকে চটালে কি চলে ?

—লোকটি নাকি অমানুষ ?

—কি জানি। কে যে অমানুষ, আমি তো দেখতে যাই নি।

—তাহলে বোধহয় দিল্লী কিংবা মাদ্রাজে গিয়েছে।

— মাদ্রাজে যাবে কেন ? তবে দিল্লীতে যাবে শুনেছি।

—কবে ?

—শিগ্‌গিরই।

—থাক্ গে। সেখানে সুখে শান্তিতে থাকুক।

—কেন ?. হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে না তোমার ?

—একটু আধটু কষ্ট হয়েছে বৈকি ? কিন্তু ও আর কতদিন ? টাকার মুখ দেখতে আরম্ভ করেছি। টাকার মুখ আলতাদির চেয়েও সুন্দর।

সুচরিতা হেসে ওঠে।

—অমন হেসে উঠছ কেন মাঝে মাঝে ?

—কিছু না।

—আলতাদি তবে বাক্‌সো পত্তর গোছগাছ করছে বল।

—তা বলতে পার। যখন-তখন ডাক আসবে।

—কিসের ডাক।

—চাকরির।

—চাকরি পাবে ?

—হ্যাঁ।

—খুব ভালো। যেমন ভাগ্য। এবারে শান্তি পাবে।

—ওর কপালে শান্তি নেই।

—কেন ?

—অমন পুড়িয়ে দেওয়া রূপ যার, সে শান্তি পায় না।

—হয়ত ঠিক। তোমরাই ভালো বুঝতে পার। কিন্তু বাবার কাছে গিয়ে থাকতে ওর বিবেকে বাধছে না?

—বাবার কাছে থাকবে কেন? মানসীর বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।

আমার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে। নিশ্বাস নিতে পারি না সহজভাবে। তাই চুপ করে থাকি। অথচ কত কিছু জানার রয়েছে। মানসী কে? তার পুরো নাম কি? সে কোথায় থাকে? তার বাড়ির নম্বর কত?

শেষে বলি—মানসী কিংবা বাতাসী যার বাড়িতে খুশী থাকুক। টালা কিংবা টালিগঞ্জে যেখানেই থাকুক আমার প্রয়োজন নেই। আমি ব্যাঙ্ক থেকে আরও দশহাজার টাকার লোন শিগ্‌গিরই পাব।

—সত্যি? কবে?

পরে জানাবো। তোমার ওই মানসী নামটা যেন জানা জানা। তুমিই বোধহয় বলেছ। সেই ময়রা স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে যে থাকে?

—সেখানে আবার কে থাকে? তুমি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘোরা-ফেরা কর নাকি? তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে না তো?

জোরে হেসে উঠি। বলি—ময়রা স্ট্রীটের কথা কে বলল কবে?

—নীলা বোধহয়।

—মোটেই নয়। আমার যদ্দুর মনে হচ্ছে তুমিই বলেছ। তোমার জানাশোনা কেউ থাকে না ওখানে?

—না। কোনোখানেই নয়।

—তাহলে কোথায় থাকে মানসী?

—ভবানীপুরে। হাজরা রোডে।

অনেক জেনে ফেললাম। কিন্তু নম্বরটা? ভবানীপুরের হাজরা রোডের দৈর্ঘ্য কালীঘাট ব্রীজ থেকে কতটা ধরব? আশুতোষ রোড অবধি? না, শরৎ বোস্ রোড পর্যন্ত? মহা মুশকিল। নম্বরটা জানতে চাইলে কি সুচরিতা বলবে?

—এক কাজ করলে হয় না সুচরিতা?

—কি কাজ ?

—না থাক। শুনি নাকি মেয়েদের মধ্যে উদারতার বড় অভাব থাকে। তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভালো। সহজ জিনিষকে জটিল করে তুলে লাভ নেই।

—অনেক তো বড় বড় কথা বললে মেয়েদের সম্বন্ধে। এবারে দয়া করে বলে ফেলে দেখ কতটা উদারতা দেখাতে পারি।

একটু দ্বিধার ভাব দেখিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলি—আমি বলছিলাম কি, আলতাদি তো চলেই যাচ্ছে কলকাতা থেকে।

—তা যাচ্ছে।

—চিরদিনের মতো বলতে পারো। ছুটি নিয়ে তোমাদের ওই মানসীর বাড়িতে এসে ওঠা কখনই সম্ভব নয়।

—তা নয়। মানসীর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

—তবে তো সব চুকেই গেল। বেচারার বন্ধু বলতে অবশিষ্ট রয়েছে এক মানসী।

—কেন ? আমি কি দোষ করলাম ?

—তোমাকে আলতাদি হয়ত বন্ধু বলেই ভাবে। কিন্তু আমি জানি তুমি বন্ধু নও।

—কি করে জানলে ?

—তুমি ওকে পছন্দ কর না। অন্তত বম্বে চলে যাবার পর থেকে ওর প্রতি তোমার মন বিষিয়ে গিয়েছে।

—সেটা কি অন্যায় ? আমার বোন হলেও বিষিয়ে যেতো। তাই বলে কি বোনের ওপর থেকে টান চলে যেতো ?

দিগম্বরের স্মিতা-উপাখ্যানের কথা মনে পড়ল। মুখে বললাম—তা হয়তো যেতো না। কিন্তু আলতাদির ওপর তোমার এতটুকুও টান রয়েছে কি ?

—না থাকলে পাড়ার সবাই যখন তাকে বয়কট করল, আমি যেচে দেখা করতে গেলাম কেন ?

কেন যে গিয়েছিলে, পরিষ্কার না বুঝলেও, কিছুটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু সেকথা মুখফুটে উচ্চারণ করা যায় না। বলি—তা বটে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

—এবারে তোমার আসল কথাটি বল।

—বলছিলাম কি, যাবার আগে ওকে বুঝতে দাও, আমরা ওর শুভাকাঙ্খী।

—কি ভাবে?

—চল। একদিন গিয়ে দেখা করে আসি দুজনা।

সুচরিতার চোখ দুটো ঝিলিক দেয়। বলে—দুজনা? তাতে তোমার সুবিধা হবে?

মেয়েরা বড্ড বেশী বোঝে কোনো বিশেষ ব্যাপারে। হতাশ স্বরে বলি—জানতাম। এর নামই হলো জটিলতার সৃষ্টি। এই জন্যেই বলতে চাই নি কিছু। ঠিক আছে। ভুলে যাও এসব।

—না। ভুলব কেন? তুমি একাই যাও। আমি যাব না। এতই যখন কাতর তুমি—

—আমি কাতর নই। আলতাদির জায়গায় নিজেকে বসিয়ে ভেবে দেখো। গেলে দুজনেই যাবো।

—না। মনসাকে আমার সম্বন্ধে নীলা কি বলেছে ঠিক নেই। আমি যাবো না।

—সেটা উচিত হবে না।

—না। তুমিই যাও।

আমি ভাবি, ঠিকানাটা বলে দিলেই তো সব চুকে যায়।

পার্ক স্ট্রীট ধরে চৌরঙ্গীর দিকে যেতে যেতে বলি—আলতাদির সঙ্গে কাল পরশু দেখা করব। তোমাকে সাক্ষাতের রিপোর্ট দেব দিন চারেক পরে। তুমি কারখানায় এসো। বিকেলের দিকে আসবে।

সুচরিতা বাধ্য হয়ে হাজরা রোডের নম্বর বলে দেয়।

একটা পুরোনো আমলের বাড়ির নম্বরের সঙ্গে সুচরিতার দেওয়া নম্বর

মিলে গেল। বাড়ির সামনে রক। তারপর সেকেলে রেলিং দিয়ে ঘেরা চওড়া বারান্দা। সেই বারান্দায় একটা বিরাট টেবিল পাতা, আর দুইপাশে কয়েকখানা নলিন চেয়ার। দেখলে মনে হয়, ষাট-সত্তর বছর আগের কোনো বিখ্যাত উকিল তাঁর মক্কেলদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে এই ধরনের বাড়ি তৈরী করেছিলেন। বারান্দায় পরপর তিন চারটে দরজা। এখনকার মতো সেই সময় মাত্র একটি দরজার ওপর পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বা ছিন্ন করার রেওয়াজ চালু হয় নি।

আমার ভেতরে যথেষ্ট উত্তেজনা। আলতাদি আছে তো? থাকলেও দেখা করবে কি? বাড়ির লোকেদের সম্মতির প্রশ্নও জড়িয়ে রয়েছে। বারান্দায় উঠে কোনো কলিং বেলের বোতাম খুঁজে পেলাম না। কিভাবে ডাকবো? যদি বলি, বাড়িতে কেউ আছেন কি? ডাকলে দরজা অবশ্যই খুলবে। কারণ ভেতরে অনেক কণ্ঠের কলরব—সরু আর মোটার সংমিশ্রণ। তবে সেটা দরজার ঠিক পেছনেই নয়। মনে হয়, ভেতরে বেশ একটি বড় চারকোণা বাঁধানো উঠোন রয়েছে। আর সেই উঠোনের ওপরে আকাশ। কারণ কথাগুলো ছাদে লেগে গম্‌গম্‌ করছে না। ওটি হল নিঃসন্দেহে অন্দরমহল।

কি ভাবে ডাকি? বললে কেমন হয়, 'মানসী দেবী আছেন কি?' নাঃ, চূড়ান্ত অভদ্রতা। তার চেয়ে কড়া নাড়াই হলো আদি এবং অকৃত্রিম উপায়।

বেশ জোরে খট্‌খট্‌ করি। ভেতর থেকে পুরুষ কণ্ঠের উচ্চ নিনাদ—কে?

বাড়ির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাড়ির লোকেরাও কলকাতার আগেকার ট্রাডিসান বজায় রেখেছে। কারণ আজকাল এই 'কে' কথাটা অনর্থক। কিংবা হয়ত অনর্থক নয়। পরিচিত কেউ হলে চেঁচিয়ে জবাব দিত। যে জবাব দেয় না, বুঝতে হবে সে আগন্তুক। তখন খালি গায়ের ওপর একটা গেঞ্জি চাপিয়ে আসার প্রয়োজন হয়।

একজন মাঝ বয়সী ভদ্রলোক সশব্দে দরজা খোলেন। ফর্সা-ঘেঁষা

রঙ। চোখ দুটো কটা কটা। রঙের তুলনায় ওষ্ঠদ্বয় একটু বেশী কালো। কেন যেন আমার মনে হয়, ভদ্রলোকের গড়গড়া টানার অভ্যাস।

—কাকে চাই ?

একটু ভূমিকা না করলে চলবে না। বলি—দেখুন, আমাকে আপনারা কেউ চিনবেন না। আপনাদের বাড়ির মানসী দেবীর এক বন্ধু এখানে থাকেন শুনলাম। তাই এসেছি। তাঁর সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন আছে। দু চারটে কথা বলব।

ভদ্রলোকের চোখের চাউনিতে অসন্তুষ্টি। সেটা অস্বাভাবিক নয়। তিনি বলেন—আপনি, ওই চেয়ারে বসুন। আমি মানসীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ধুলো-পড়া চেয়ারে বসে পড়লাম। একটা নিশ্চিন্ততার ভাব। সেই সঙ্গে অনিশ্চয়তার শঙ্কা।

একটু পরে দরজার সামনে একজন তরুণী এসে দাঁড়ায়। আমাকে দেখেই বলে ওঠে—ও, আপনি এসেছেন।

হতচকিত হই। আমাকে চেনে নাকি ? নিশ্চয় ভুল করেছে। উঠে দাঁড়াতে যাই।

মেয়েটি বলে—বসুন। উঠছেন কেন ?

তবু কিন্তু সে এগিয়ে এলো না দরজার চৌকাঠ ছেড়ে।

—আপনিই মানসী দেবী ?

—হ্যাঁ।

—আমি আপনার অপরিচিত।

—হ্যাঁ। তবে আপনাকে আমি দেখেছি। আপনার পরিচয়ও জানি।

—নীলা বলতে পারে।

—হ্যাঁ।

—আমি নীলার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে এসেছি।

—ঠিকানা পেলেন কোথায় ? সুচরিতা দিয়েছে ?

—হ্যাঁ।

মানসীর মুখে রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে—না। বোধহয় আপনার সঙ্গে দেখা করবে না।

—কেন?

—সে কথা আমি বলতে পারি না। তবে সে আমার সঙ্গে আসতে চাইল না এখানে। তাই একা এসে দেখা করলাম।

বাড়ির ভেতরের কলরব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মনে হতে লাগলো, বারান্দার সবগুলো জানলা আর দরজার আড়ালে সবাই ভিড় করেছে।

—দয়া করে ওকে বলুন, আমি কয়েকটি কথা বলে চলে যাবো। শুধু ভদ্রতা করে একটু দেখা করলেই চলবে।

মানসী কি যেন ভাবে। তারপর বলে—দেখি। আসে কি না।

সে ভেতরে চলে যায়।

আলতাদির কাছে আমি অবাঞ্ছিত। সে এখন নতুন জীবনের সন্ধানে চলেছে। পুরোনোকে ধুয়ে মুছে ফেলতে চায়।

একটু পরে মানসীর সঙ্গে সে আসে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকি। ওর মুখের মালিন্য, যা শেষবার দেখেছিলাম, এখন আর নেই। সজীবতা ফিরে এসেছে, স্বাভাবিক। তবে আগের সেই হাসিখুশী ভাব নেই। কেমন যেন বিপদমাখা।

মানসীর সঙ্গে সে-ও দরজা অবধি এসে থেমে যায়। প্রশ্ন করি—একটু বসবে না?

মানসীর সামনে আমি সঙ্কুচিত। কি বলব ভেবে পাই না। চুপ করে থাকি।

—বল দীপ্তেনদা, কি বলবে। আমি একটু পরেই বার হবো।

—ও। না, আমি দেখা করতে এসেছিলাম। সেদিন আমি বড় রূঢ় ব্যবহার করেছিলাম। ক্ষমা চাইতে এলাম।

আলতাদি মুখে হাসি এনে বলে—ক্ষমা চাওয়ার কি আছে? ব্যবহার তো খারাপ করনি।

—তুমি চলে যাচ্ছো আলতাদি?

কথাটা বলে ফেলেই মানসীর দিকে তাকাই। সে হেসে ফেলে বলে

—আমি আসছি ভেতর থেকে।

—হ্যাঁ, দীপ্তেন দা। এখানে কোথায় থাকবো?

কতো কথা বলব ভেবেছিলাম। কিছুই যে বলতে পারছি না। পরিবেশ তার জন্যে দায়ী কি? এখানে না হয়ে জনক রোডের ফ্ল্যাট হলে অনেক কথাই বলতে পারতাম হয়তো।

মরিয়া হয়ে বলি—তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

—দেখা তো হলো।

—এখানে নয়। অন্য কোথাও।

—না। তা সম্ভব নয়। তাছাড়া কেনই বা শুধু শুধু দেখা করতে চাও?

—আলতাদি আমার মনে হয়, কোথাও ভুল হয়েছে।

—কিসের ভুল?

—তা জানি না। মনে হয়, তুমি ভুল বুঝে বসে আছো আমাকে।

—তোমাকে ভুল বুঝব আমি? না দীপ্তেন দা, আমাকে অত ছোট ভেবো না। তোমার মতো মন ক'জনের হয়? সবাইকে সেকথা আমি বলি।

—সবাইকে? তারা কে?

—আমার যারা পরিচিত। যারা এখনো আমাকে দেখলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় না।

—শোন আলতাদি। আমার একটা সন্দেহ হয়।

—কিসের সন্দেহ?

—আমার মনে হয় সুচরিতা এমন কিছু বলেছে, যার জন্যে তোমার মন ভেঙে গিয়েছে।

—ছিঃ ছিঃ দীপ্তেন দা। এ ধরনের সন্দেহ বাতিক তোমার অন্তত থাকা উচিত নয়। এতে তোমার জীবন বিষময় হয়ে উঠবে।

—কেন?

—হবে না? বুঝতে পার না কেন?

—আমি বুঝতে পারলাম না।

আলতাদি হেসে বলে—তবে আর এখন বুঝে কাজ নেই। পরে বুঝবে। তখন আমি এখানে থাকবো না বটে। তবু তোমার মনে হবে, আলতাদি ঠিক কথাই বলেছিল। আমাকে তখন ধন্যবাদ দিও মনে মনে।

—এসব কি বলছ তুমি? তোমাকে আমি কোথাও যেতে দেব না। সেইজন্যেই এসেছি।

আলতাদির চোখের মধ্যে আতঙ্ক ফুটে উঠল কি? বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তার স্বাভাবিক স্বচ্ছ দৃষ্টি যেন কেমন হয়ে গেল। আমার দিকে আগের মতো চাইতে পারল না।

—আমি তোমার ওপর কোনো জোর করছি না। এটা আমার প্রার্থনা। কেন যাবে? আমি জানি এখানে তোমাকে দেখার কেউ নেই। তোমার চাকরি নেই। আমি কথা দিচ্ছি আলতাদি, চাকরী একটা খুঁজে দেবই। আর যতদিন না পাও, আমি ভার নিচ্ছি।

আলতাদি চেয়ার ছেড়ে সহসা উঠে দাঁড়ায়। তার চোখেও ক্রোধের প্রকাশ।

সে বলে—কথাটা বলতে তোমার একটুও বাধলো না দীপ্তেন দা? তুমি কি মনুষ্যত্ব হারাবে?

—মনুষ্যত্ব হারাবো? কেন?

—আর একজনের কথা একবারও মনে এলো না। সে তোমাকে কতটা বিশ্বাস করে একবারও ভাবলে না?

—কে? কে আমাকে বিশ্বাস করে?

আলতাদি ঘরের দিকে পা বাড়িয়েও থেমে যায়। তার হয়তো মনে হয়, এভাবে চলে যাওয়াতে আমাকে চূড়ান্ত অপমান করা হবে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—বাড়ি যাও দীপ্তেন দা। যে কদিন কলকাতায় আছি শান্তিতে থাকতে দাও। আর এখানে এসো না।

আলতাদি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। স্বপ্নেও আমি ভাবতে পেরেছিলাম

একথা ?

তবু বলি—আমি আসব না নিজে থেকে। শুধ আমার প্রার্থনাটক রেখো। কলকাতা ছেড়ে যেও না।

—অসম্ভব। আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। তুমি যাও।

আলতাদি আর একবারও পেছন ফিরে চাইল না। সে সোজা ঢুকে গেল বাড়ির ভেতরে। আমি অবসন্নের মতো বসেই রইলাম। কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল।

একটু পরে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই সিঁড়ির দিকে।

—শুনুন।

ফিরে দেখি মানসী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সে এগিয়ে এসে বলে—এভাবে কখনো আসতে হয় ?

মেয়েটির কথা আমার মাথায় ঢোকে না। কথাটা ঢুকলেও অর্থ আবিষ্কার করতে পারি না।

—কেন ? কি হয় এলে ?

—নীলাকে কি ভাবেন আপনি? একজন প্রতারকের খপ্পরে পড়ে বম্বে গিয়েছিল বলে সে সস্তা হয়ে গিয়েছে ?

—আলতাদি সস্তা হয়ে গিয়েছে ? আমি সেই কথা ভাবি ? একবার আপনার বন্ধুকেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন তো তেমন কথা আমি ভাবতে পারি কিনা ?

মানসী বিরক্তির সঙ্গে বলে—সত্যিই আপনাদের অভিনয়ের তুলনা হয় না। আপনাদের মতো কিছু মানুষের জন্যে সমস্ত পুরুষ জাতটার ওপর অবিশ্বাস এসে যায়।

এতবড় অপবাদ আমাকে সইতে হলো। তবু রাগতে পারলাম না। শুধু চেয়ে রইলাম আলতাদির বন্ধুর দিকে। বললাম—অভিনয় আমি করি। কিন্তু আলতাদির সঙ্গে নয়।

—তবে বুঝি সুচরিতার সঙ্গে ?

গম্ভীর হয়ে বলি—সেকথা আলতাদির মুখে মানাতো ভালো। আপনার মুখে নয়।

—তা অবিশ্যি ঠিক। এই একটা কথা ঠিক বলেছেন।

—শুনুন, আলতাদি আমাকে অপমানিত করতে পারে। তাতে যায় আসে না কিছু। কিন্তু আপনার সেই অধিকার আছে কি ?

—না। তবে ওর মতো আমি সুন্দরী হলে বোধহয় অধিকার-বোধ নিয়ে এতটা সচেতন হয়ে উঠতেন না। আত্মসম্মানেও ঘা লাগত না আপনার।

—আর কিছু বলবেন ? আমি শুনতে প্রস্তুত। কারণ আপনি তার বন্ধু।

—না বিশেষ কিছু নয়। শুধু বলতে পারেন, কাল সন্ধ্যায় লাউডন স্ট্রীটের লাইট পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে সুচরিতার সঙ্গেও কি অভিনয় করছিলেন এমনি ভাবে ?

আমার সারা শরীরের রক্ত চলাচল যেন বন্ধ হয়ে যায়। ভাঙা গলায় বলি—কে বলল আপনাকে ?

—কাউকে বলতে হয় নি। স্বচক্ষে দেখেছি। নীলাও দেখেছে।

—ও। এরই জন্যে এতো কথা ? এরই জন্যে অপমান ?

মানসী কৃত্রিম হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে বলে—হ্যাঁ, শুধু এরই জন্যে। তাই আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম।

আমি সিঁড়ির দিকে ফিরি।

হেসে মানসী বলে—কই, বললেন না? কালকের ওই নির্জনে দাঁড়িয়ে আলাপ—ওটাও কি অভিনয় ?

—হ্যাঁ। অভিনয়।

—কেন ?

—সুচরিতার কাছ থেকে আলতাদির ঠিকানা নেবার জন্যে—সে আপনারও বন্ধু।

নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে পড়ি। আলতাদিকে অন্য কোথাও দেখতে পেলে বড় ভালো হতো।

মনের ভেতরে ঝড় বইলেও, বাইরে শান্তই থাকি। কারখানার কাজে কিছুমাত্র গাফিলতি হতে দিই না। তবে এক এক সময় মনে হয়, কারখানার গুরুদায়িত্ব না থাকলে যেন বেঁচে যেতাম। অন্তত উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে পারতাম আপন খুশীতে। কোনোরকম বন্ধন আর নিয়মানুবর্তিতা অসহ্য লাগে।

কেউ না বুঝলেও মা বুঝতে পারেন মনের অবস্থা। ডেকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন—তোর কি হয়েছে?

—কিছু না তো?

মা কথাটা গায়ে না মেখে বলেন—দুশ্চিন্তাটা কারখানার জন্যে, না সেই মেয়েটার ব্যাপারে?

মায়ের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলি—ও চলে যাচ্ছে ভারতের বাইরে।

—তুই থাক্‌তে বলেছিলি?

মাকে আমি আলতাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে কিছুই বলি নি কোনো-দিন। তবে তিনি জানেন, সে আছে। সে অতিমাত্রায় আছে। ব্যস্‌, আর কিছু নয়।

তাঁর কথার জবাবে বলি—বলেছিলাম বৈকি।

—শুনলো না?

—না। আমার ওপর হঠাৎ অন্য রকমের ধারণা হয়েছে কেন যেন।

—তুই বুঝি জোর করে ধারণা পাল্টাতে চেষ্টা করেছিলি?

—চেষ্টা করব না?

—করবি বৈকি। তবে তাড়াহুড়ো করতে নেই।

—দেরি করলে সে যে চলে যাবে।

—সেও ভালো। ঘুড়ির সুতোয় জট-পাকালে কি করতিস?

—তোমার কাছে ফেলে দিতাম।

মা হেসে ফেলেন—তাই বলে এই জটও ফেলে দিস না আমার কাছে

আমি বলছিলাম সুতোর জট খুলতে অনেক ধৈর্যের দরকার।

—কিন্তু এখানে ধৈর্য ধরলে সে যে চলে যাবে।

—যাক।

মাকে আর কি বলব ? বলতে পারি না আলতাদি আমাকে বন্ধু দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে ভুল বুঝে চলে যাচ্ছে চি কালের জন্যে। তার সঙ্গে হয়তো জীবনে আর দেখাই হবে না সে চ যেতে চায় যাক। কিন্তু আমাকে যেন ভুল না বোঝে। সুচরিতার স আমি যে সত্যিই অভিনয় করেছিলাম। সে-ও তো আমার সঙ্গে অভি নয়ই করে। তবে আমার অভিনয় নিষ্ফলা। তার অভিনয় জীবনে স্থায়ী আশ্রয় লাভের জন্যে। সে জানে, মন দেবার প্রশ্ন তার ওঠে না। কার আমার কাছে ব্যর্থ হলে আর একজনকে দেখতে হবে। সেখানে অভিনয় করবে একই ভাবে। তারপর যখন কারও সঙ্গে বিয়ে হবে তখন তাকে হয়তো সত্যিই ভালবাসবে। কিংবা ভালবাসার অভিনয় করতে করতে আসল ভালবাসার স্বপ্ন কাউকে দিতেও পারবে না নিজেও আস্বাদন করতে পারবে না কোনোদিন।

কারখানায় ছুটি ছিল। ভাবছিলাম, আর একবার আলতাদির সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব। ঠিক সেই সময় অরিন্দম এসে বাইরে থেকে ডাকে। সে মানুদের রকের আড্ডায় এসেছে। ওখানে বসার আগে একবার আমাদের বাড়িতে আসে।

অরিন্দমকে মা খুবই পছন্দ করেন। অরিন্দম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুবই উঁচু। প্রায়ই বলেন—একটি রত্ন খুঁজে বার করেছিস দীপু। একশোবার স্বীকার করব এ কথা।

—তবে ? রতনে রতন চেনে। ওকে রত্ন বলা মানে, আমাকেও রত্ন বলে স্বীকার করে নিচ্ছে।

অরিন্দম ডাকলে মা গিয়ে দরজা খুলে দেন।

সে ভেতরে এসে বলে—কি ব্যাপার ! সব যে থমথমে মনে হচ্ছে।

মারধোর করেছেন নাকি মাসীমা ?

আমি বলি—না। মারব বলে বসে আছি।

—কাকে ?

—কাছে এসো। দেখিয়ে দিচ্ছি।

অরিন্দম হেসে ওঠে। বলে—চল, ওদিকে ওরা যে বসে রয়েছে। চায়ের অর্ডার দেওয়া হয়ে গিয়েছে নন্দর দোকানে।

উঠতে হয়। কথা দিয়েছি মানুদের। তা ছাড়া অরিন্দম তো আমাকে ছাড়বে না।

ওদের কাছাকাছি যেতে মানুরা হৈচৈ করে ওঠে।

সুখেন মন্তব্য করে—ম্যাগনেট এসে গিয়েছে। নন্দ শিগ্‌গির চা।

আমি বলি—ম্যাগনেট মানে ?

—চুম্বক। জানিস না ?

—তা তো জানি।

—তবে? তুই হলি আমাদের মধ্যমণি। আমরা রেকর্ড ব্রেক করেছি।

—কি ভাবে ?

—লোকে ভাবে, রকে যারা বসে তারা সমাজের বোঝা। নিষ্কর্মা বেকার। কিন্তু আমাদের মধ্যে তুই এসে গিয়ে একটা সেকেলে চিন্তা-ধারায় ওলোট-পালোট করে দিয়েছিস। দেখবি দুদিন বাদে পাড়ার সব কর্মবীরেরা রকে বসতে শুরু করবে। তবে এই সেনগুপ্তের রকের ভাগ আমরা কাউকে দেব না।

মানু বলে—তা ছাড়া তুই তো দুদিন বাদে বিজিনেস ম্যাগনেট হয়ে যাবি। তোর দিনকে দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক ভাই। সেই সঙ্গে তোর ডেপুটিরও উন্নতি হোক। আমরা নয়ন ভরে দেখব।

অরিন্দম বলে—তোরা বুঝি চিরকাল এইভাবেই চালাবি ?

—এতে যে কী সুখ তোরা বুঝবি না। আজ যদি একটা কিছু জুটে যায় আমাদের, তাহলে বাড়িতে আদরযত্ন বেড়ে যাবে। খাওয়ার সময় কেউ গালাগালি দেবে না। ওরে বাপ্‌স্‌ ভাবতেই মাথা ঝিমঝিম করছে।

পেটের ভাতই হজম হবে না তাহলে।

অরিন্দম বলে—আসলে তোরা অকম্মার ঢেঁকি?

সুখেন বলে—ঢেঁকি বলে কোনো পদার্থ আজকাল আছে নাকি? ওটে
মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে শুনলাম। তার চাইতে বল্, অকম্মার হাস্কি
মেশিন।

মানু চেঁচিয়ে ওঠে—তুই-ও ওর তালে তাল দিলি সুখেন? মেনে নিি
আমরা অকম্মা?

—না, তা মানব কেন? কথাটার ভুল ধরিয়ে দিলাম। আমরা অকম্
কে বলল? এই তো দুদিন বাদেই রবি ঠাকুর করছি।

আমি বলি—রবি ঠাকুর করছিস মানে?

—বাঃ, কদিন বাদে পঁচিশে বোশেক না? ভুলে যাস কেন? তোদে
দেখছি বাঙলা ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে সম্পর্কই নেই।

মানু বলে—মোটা চাঁদা দিস ভাই। আগে থাকতে বলা রইল। বাঙলা
লতা, কলকাতার কিশোর, সবাইকে আনার চেষ্টা হচ্ছে।

অরিন্দম চমকে ওঠে। বলে—ওরা আবার কারা?

—কিছু খবর রাখিস না। ওদের নাম জানি নাকি? শুধু আসরে ব
চোখ বুঁজে থাকবি, মনে হবে লতা কিংবা কিশোরই গাইছে। এ
নামেই ওরা বিখ্যাত হয়েছে। অপূর্ব ভাই। জবাব নেই।

আমি বলি—শেষে নকল নিয়ে কারবার শুরু করলি মানু?

—নকল? তা বলতে পারিস। কিন্তু ডিম্যাণ্ড কত। লোকে যা চা
তাই তো আনতে হবে? নইলে পরের বছর চাঁদাই দেবে না।

সুখেন বলে—রবি ঠাকুর করার পর একমাস যেতেই হবে হকার দেবী
পুজো। আষাঢ় মাসে হবে সেটা।

—হকার দেবী? সেটা আবার কি জিনিষ?

সুখেন জিভ কেটে বলে ওঠে—ছি ছি দীপু। ওভাবে বলিস না। খু
জাগ্রতা দেবী তিনি।

—নাম শুনি নি তো কখনো।

—এই পৃথিবীতে কোনো দেব-দেবীই ছিলেন না আগে। মওকা বুঝে যুগের চাহিদা অনুযায়ী মূর্তিমতী হয়ে তাঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন। হকার দেবীও তেমনি একজন। স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন ও পাড়ার পল্টুকে। না না স্বপ্নে না জাগ্রত অবস্থায়।

—কোন্ পল্টু?

—বাঃ, ভুলে গেলি? ইস্কুলে একসঙ্গে পড়তাম না? মাকুন্দ পল্টু। মুকুন্দবাবুর ছেলে। যাকে বলা হতো, মুকুন্দস্য অপত্য ইতি কলটু মাকুন্দ।

অরিন্দম হো হো করে হেসে ওঠে।

এবারে মানু গম্ভীর হয়ে বলে—গড়িয়া হাটের ফুটপাতে ওর দোকান দেখলে তোর হাসি বন্ধ হয়ে যাবে অরিন্দম। চুলের রীবন আর শাড়ির ফলস্ বেচতে বেচতে এখন রমরমা অবস্থা।

আমি বলি—কী স্বপ্ন দেখেছিল পল্টু?

—সে এক রোমহর্ষক ব্যাপার। গত আষাঢ় মাসের কথা। এই দেখ আমার লোমকুপ কিরকম খাড়া হয়ে উঠেছে ভাবতেই।

—বল্। আগে শুনি।

—গত আষাঢ় মাসে। তখন সন্ধে হবো হবো। দুপুর থেকে প্রবল বৃষ্টি। পল্টু তখনো এখনকার ফুটপাথের ঘর পায় নি। ফুটপাথের ওপর কাপড় বিছিয়ে বেচাকেনা করত। বৃষ্টিতে ফুটপাথ জলমগ্ন। লোক চলাচল প্রায় বন্ধ। পল্টু একজনের দরজার নিচে মালপত্র রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। মন খারাপ। এক পয়সার জিনিষও বিক্রি হয় নি। ঠিক তখন। উঃ আর বলতে পারছি না। তুই বল. সুখেন।

নন্দর চা এসে যায়। খেয়ে নিয়ে সুখেন বলে—হ্যাঁ, ঠিক সেই সময়। থৈ থৈ জল। লোডশেডিং হয়ে গেল। ব্যস্।

সুখেন থেমে যায়।

অরিন্দম বলে ওঠে—ব্যস্? শেষ হয়ে গেল?

—আরে না না। আরম্ভ হবে এবার। হ্যাঁ ঠিক সেই সময়। সেই

বিদঘুটে অন্ধকারের মধ্যে পল্টু হঠাৎ দেখতে পেল একটা আলো। তার চেয়ে হাত চারেক দূরে। ইলেকট্রিকের নয়, টর্চেরও নয়। কিসের বল্ দেখি?

অরিন্দম ক্ষেপে গিয়ে বলে—গ্যাসের।

—ঘোড়ার ডিম। ছবিতে দেবদেবী আর মহাপুরুষের মাথার কাছে যেরকম জ্যোতি থাকে সেই রকমের জ্যোতি। আর তার পরেই এক বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হয় সেই জ্যোতির মধ্যে থেকে।

মান্নু চেঁচিয়ে ওঠে—তুই থাম্। এবারে আমি বলি। হ্যাঁ, সেই পুরুষ সামনে এসে দাঁড়াতেই পল্টুর মুর্ছা যাবার অবস্থা এমন গোঁফ-ওলা টকটকে রঙের মানুষটি কখনই মানুষ নন। নিশ্চয় দেবতা। ঠিক কার্তিকের মতো চেহারা। মনে হয় কার্তিকই, অথচ চারটে হাত। তিনি পল্টুকে বলেন—আমায় চিনতে পারছ পল্টু? করজোড়ে পল্টু বলে—চিনি চিনি করেও চিনতে পারছিনা দেবতা। আমার অপরাধ নেবেন না। তখন দেবতা বলেন—কোনো দোষ নেই তোমার। আমার বাহনটি সঙ্গে থাকলে ঠিকই চিনতে পারতে।

সুখেন বলে ওঠে—তুই অনেকটা বললি মান্নু, এবারে আমি বলি। হ্যাঁ তারপরে তিনি বলেন, আমি হচ্ছি স্বয়ং বিশ্বকর্মা। পল্টুর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সে বলে—আমি ভাবতাম দেবতা-টেবতা সব গ্যাঁজা। আপনাকে দেখে সেই ভুল ভেঙে গেল। আমি অতি পাপী। বিশ্বকর্মা হেসে বলেন—কোনো দোষ নেই তোমার। শোন, আমি তোমার অবস্থা ফিরিয়ে দিতে এসেছি, শুধু একটি সর্তে। পল্টু বলে—কোন্ সর্ত দেবতা? আমার একটি বোন রয়েছে। তাকে নতুন নামে পুজো করতে হবে।

মান্নু বলে ওঠে—হ্যাঁ সেই দেবীই হলেন হকার্স দেবী। তাঁকে পুজো করলে হকারদের অবস্থা ফিরবে। বৃষ্টির মধ্যেও সমান তালে বেচা-কেনা চলবে। আসলে তাঁর কৃপাতেই পল্টু এখন ফুটপাথ থেকে চালা-ঘরে ঢুকেছে। সপ্তাহে দুদিন মাছ খাচ্ছে।

অরিন্দম হাসতে গিয়েও মান্নুর দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে যায়।

সুখেন বলে—আমি একদিন মাংস কিনতেও দেখেছি। আমাদের কসবার মাংস ভারত বিখ্যাত জানিস তো ?

অরিন্দমের বিকৃত মুখ দেখে মান্নু ঝট্ করে বলে ওঠে—যদি না জানিস, তবে জেনে রাখ। বিশ্বকর্মা পূজোর আগের রাতে এসে দেখে যেতে পারিস।

অরিন্দম চটে গিয়ে বলে—আমি মাংসের কথা শুনতে চাই নে। হকার্স দেবীর কি হলো, তাই বল্।

—কি আবার হবে ? আসছে আষাঢ়ের প্রথম পূর্ণিমায় পৃথিবীতে প্রথম হকার্স দেবীর মূর্তি পূজো হবে।

—মূর্তি কেমন হবে ?

—সেই কথাও বিশ্বকর্মা বলে দিয়েছেন। তাঁর মুখ যেমন কার্তিকের ছাঁচে তৈরি হয়, হকার্স দেবীর মুখ তেমনি লক্ষ্মীর ছাঁচে তৈরি হবে। গায়ের রঙও এক। তবে ট্রেনের হকার্সদের কথা মনে রেখে তাঁর বাহন হবে ইলেকট্রিক ট্রেন। বিশ্বকর্মার মতো তাঁরও চার হাত। সেই হাতে চিনেবাদামের প্যাকেট থেকে শুরু করে সেপ্‌টিপিনের মালা, শাড়ি ব্লাউস সব কিছু ঝোলানো থাকবে।

আমি বলে উঠি—চমৎকার। নতুন আইডিয়া।

মান্নু ক্ষেপে ওঠে—আইডিয়া কে বলল? আদেশ। আগের ভক্ত কবিরা স্বপ্নে আদেশ পেতেন। পল্টু পেয়েছে জাগ্রত অবস্থায়। সেই সন্ধ্যে-বেলাতেই পল্টুর সব রীবন্ আর ফল্‌স্ বিক্রি হয়ে যায়। বৃষ্টি থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একদল মেয়ে এসে হাজির একটা ইস্কুল থেকে। পরের দিন তাদের কী একটা অনুষ্ঠান ছিল। সব কিনে নিয়ে চলে গেল। হকার্স দেবীর কৃপা ছাড়া কি বলবি বল্ ? নইলে তখন রাস্তার আলো আবার জ্বলে উঠবে কেন ?

—তা বটে।

—চাঁদা দিবি কিন্তু।

—অবশ্যই দেব। কিন্তু ইলেকট্রিক ট্রেনটা খুব বড় হয়ে যাবে না?
—আরে না। শুধু সামনেরটুকু। বিশ্বকর্মা ডিটেল্‌স্ বলে দিয়েছেন পল্টুকে। সেই অনুযায়ী একটা ছবিও আঁকিয়ে নিয়েছে সে।
মানুষের আড্ডায় বসে মনটা হাল্‌কা হয়ে যায়। ক'দিন ধরে মনের টুঁটি চেপে ধরে রেখেছিল কে যেন। এখন সে সমস্ত কিছুই নেই। স্বাভাবিক ভাবে হাসতে পারি।

আলতাদির সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে যায় পরদিনই সন্ধ্যায়। গিয়েছিলাম কলামন্দিরের বিপরীত দিকে একটি রবার প্রতিষ্ঠানে, কারখানার কাজে। ফিরে আসার সময় কলামন্দিরের সামনে আলতা-দিকে দেখে চমকে উঠলাম।
যার কাছে আর কখনো যাব না বলে স্থির করেছিলাম, দেখলাম নিজের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে তারই দিকে এগিয়ে চলেছি। নিজেকে প্রশ্ন করলাম—এ তুমি করছ কি? আমার ভেতরের মানুষটি কাঁপা গলায় উত্তর দিল—অন্যায় করছি নাকি? বুঝতে পারছি না তো?
আলতাদির কাছাকাছি গিয়ে ভাবলাম, মুখ গম্ভীর করে কথা বলব না আর। অত্যন্ত সহজ আচরণ করব। যেমন করতাম সেই লেকে ক্রিকেট খেলার সময়।
কলামন্দিরের সামনে কিছুটা ভীড় ছিল। বাইরে বড় বড় পোস্টার। তাতে বম্বের এক নামকরা গায়কের ছবি আর তাঁর নাম। তিনিই আজকের আকর্ষণ।
বুঝলাম, আলতাদি গান শুনতে এসেছে। সে-ও কি মনকে হাল্‌কা করে নিতে এসেছে? হয়তো তাই। আমার মতো তার সেন্‌গুপ্তের রকের আড্ডাখানা নেই। কিন্তু সঙ্গে মানসী এসেছে কি? এ দিকে ও দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। মনের বোঝা নামলো।
ঠিক আলতাদির পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। তবু সে লক্ষ্য করে না। কারণ

আমি ভীড়েরই অংশ মাত্র।

কি বলে শুরু করব এখন ? লেকের মতো পরিহাস-ছলে কথা বলতে গিয়ে গলা যে বুজে আসে। সেইসব দিন অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। তখন জানতাম আলতাদি দুঃখ কাকে বলে জানে না। তখন ভাবতাম সে আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরের একজন কেউ। কিন্তু এখন সে কথা ভাবতে পারি না। তবু আজ সেই ভাবেই কথা বলব। বুঝতে দেব না আমার হৃদয় কেঁদে চলেছে।

আলতাদি হঠাৎ ভেতরের দিকে চলতে শুরু করে। আর আমি অত্যন্ত বর্বরের মতো একটা কাজ করে ফেলি। আমি তার উড়ন্ত আঁচল চেপে ধরি। পেছনে টান পড়তে সে ফিরে তাকায়।

দর্শকদের কেউ অতটা লক্ষ্য করে নি। লক্ষ্য করলেও হয়ত ভেবেছে আমারই নিকট আত্মীয়া বুঝি। তাই তাদের মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই। তবু আমি আলতাদির চাহনি দেখে মরমে মরে যাই।

সে একপাশে সরে গিয়ে বলে—অনেক গুণ আছে দেখছি। আগে তো জানতাম না ? কার কাছে শিখলে ?

—জর্জ বার্ণাড শ'।

ভ্রূ কুঁচকে সে বলে—তার মানে ?

—বার্ণাড শ'-এর কাছে এসেছি। শুনেছি লণ্ডনের কোনো সভায় তিনি উপস্থিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিনতেন না বলে কথা বলেন নি। বার্ণাড শ' অত্যন্ত রেগে গিয়ে তাঁর আলখাল্লায় হেঁচকা টান দিয়ে নিজের নামটি বলে দিয়েছিলেন।

মা সরস্বতী স্বয়ং নিশ্চয় এই সময় আমার জিভের ডগায় ভর করেছিলেন। নইলে এ অবস্থায় অমন ভাবে কিছুতেই বলতে পারতাম না।

আলতাদি বলে —রসিকতাটুকু পুরোমাত্রায় আছে দেখছি এখনো।

—আছে কি নেই পরখ করে দেখেছ কখনো ?

—প্রয়োজন নেই। তবে একটা কথা বলে রাখি, ভবিষ্যতে অন্য কোনো

মেয়ের আঁচল এ ভাবে টেনো না।

—কখনই না। তুমি সাবধান না করে দিলেও টানতাম না।

আলতাদির লালমুখ আরও লাল হয়ে ওঠে। সে বলে—তাহলে মানসী ঠিকই ধরেছে। তুমি আমাকে খুব সস্তা ভাব, তাই নয়?

—তোমার বন্ধুর মস্তিষ্কের ওপর ফার্টিলাইজার কম্পানীর পক্ষপাতিত্ব অপরিসীম। পৃথিবীতে মাত্র আর একজনের আঁচল আমি এইভাবে টানতে পারি।

—সুচরিতা?

—তোমার ওপর সুচরিতার ভূত চেপেছে।

—রহস্য ছাড়ো। সেই মহিলাটি কে?

—মা। আমার মা।

আলতাদির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় কথাটা শুনে। সে কী যেন বলতে গিয়েও থেমে যায়। তারপরে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠে বলে—আমি চলি। এখনি শো আরম্ভ হয়ে যাবে।

—জানি। তোমাকে আটকাব না। পারবও না আটকাতে।

—নিশ্চিন্ত হলাম কিছুটা।

—কেন? এখনো আমার লেগ-ব্রেকের ভয় কর নাকি?

আলতাদির ওপর আমার হাল্‌কা চালের প্রভাব পড়ে। সে একটু হেসে বলে—না। লেক-ব্রেকের চেয়ে তোমার টপ্‌ স্পিন্‌ অনেক বেশী মারাত্মক।

—তাই নাকি? জানতাম না তো? এই জন্যেই সব ব্যাপারে গুরুর কাছে ট্রেনিং নেবার রেওয়াজ। নিজেকে মানুষ নিজে চিনতে পারে না। অন্য কেউ চিনিয়ে দেয়।

—এবারে আসি?

—হ্যাঁ। এসো।

—এ ভাবে আমাকে বাড়ি থেকে ফলো করো না। এটি আমার প্রার্থনা। যে কয়টা দিন দেশে আছি বদনামের ভাগী হতে চাই না আর।

আলতাদির সন্দেহ অমূলক নয়। সত্যিই এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। মাত্র কালই তার বাড়িতে গিয়ে দেখা করে এসেছি। আবার আজ এই অসময়ে তুজনার বাড়ি থেকে এতটা দূরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়াকে দৈব বলে মেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব।

—একটা কথা বিশ্বাস করবে আলতাদি ?

—কি কথা ?

—আমি যদি বলি, আমি মিথ্যা বলছি না, তাহলে বিশ্বাস করবে ?

—করব বৈকি। তোমার ওপর আমার সেটুকু বিশ্বাস বোধহয় আছে।

—আমি তোমাকে ফলো করি নি।

—কি ভাবে এলে তবে এতদূর ? টিকিট কিনেছ তুমিও ?

—না। আমি এসেছিলাম ওই লাল বাড়িটায়। কারখানার ব্যাপারে। কয়েকখানা রবার দেওয়া ত্রিপলের দরকার।

—বিশ্বাস করলাম।

—এবার তাহলে এসো। আমি যাই।

কথাটা বলতে খুবই কষ্ট হয়। সম্পর্কটা আগের মতো থাকলে চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে উঠতে পারত।

—হ্যাঁ। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

—এমনি। আজ তাড়া নেই আর। বাড়ি ফিরব।

—তুমি আগে যাও।

—না। জীবনে আর তো দেখা হবে না। পুরুষ হয়ে তাই আগে যেতে পারি না। তুর্নাম রটবে।

—কে রটাবে ?

—আমার বিবেক। এটাকে ঠিক ক্রিকেট বলা যায় না।

—তুমি ক্রিকেটের ছাই জানো। তা হলে তুমিই আগে যেতে। কারা বিদায় দেয় দেখতে পাও না ?

—কোথায় দেখব ?

—সর্বত্র। উপন্যাস, নাটক সিনেমায়।

শুকনো হেসে বলি—সেক্ষেত্রে পুরুষেরা বিদায় নেয়। কিন্তু আমাদের বেলায় তা নয়। এখানে তুমিই বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছ অনেক দূরে।

—তুমি কি আমাকে শাস্তি দেবে না?

—আলতাদি, বিশ্বাস করো, আমি কায়মনবাক্যে তোমাকে শান্তি দিতে চাই।

—না। হয় না।

—কি হয় না?

—তুমি যাও দীপ্তেনদা। সুচরিতার কথা ভুলে যাও কেন?

—সুচরিতা? সে এর মধ্যে কি করে আসে?

—জানো না?

—না। শো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে আলতাদি। যাবে না?

—কেন তুমি যেতে চাইছো না?

—শেষ বারের মতো একটা ছবি এঁকে নিতে চাই মনের মধ্যে। ভাবতে হবে না নিরালায় বসে? নইলে কোন্ অণুপ্রেরণায় কারখানার কাজ করে যাব আলতাদি? তুমিই না বলেছিলে ওটা অনেক বড় করতে হবে।

—ছি ছি ছি। সুচরিতা কি ভাববে। অমনভাবে বলো না।

আলতাদি চোখে আঁচল দিয়ে স্খলিত চরণে কলামন্দিরের ভেতরে চলে যায়।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে আসে আমার। আলতাদির চোখে জল কেন? আমার ব্যবহারে সে কি মর্মাহত? বুঝতে পারি না।

কারখানার সবাই মনস্থ করেছে এবারে তারা বিশ্বকর্মা পুজো করবে। পুজোর এখনো চার পাঁচ মাস দেরি। তবু কথাটা এখন তুলেছে। কারণ এখন থেকেই তাদের পারিশ্রমিক থেকে কিছু কিছু কেটে নিয়ে একটা ফাণ্ড বানাতে চায় তারা। আশে পাশের কারখানাগুলোতে খুব সমারোহের সঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজো হয়। আমাদের কারখানা তাদের সঙ্গে

পাল্লা দিতে চায়। এদের এই উৎসাহব্যঞ্জক মনোভাব খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি কারখানার মধ্যে কোনোরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী নই।

অরিন্দমকে আমার মনোভাব জানাতে সে বলে—কথাটা মিথ্যে নয়। ধর্ম নিয়ে নাচানাচি করা আমিও পছন্দ করি না। তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম।

অরিন্দমের যুক্তি আর চিন্তাকে আমি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তাকে বুঝিয়ে বলতে বলি।

সে বলে—বিশ্বকর্মা দেবতা হলেও, কারখানায় কারখানায় এই পুজো অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব কম শ্রমিকই এই প্রভাব থেকে মুক্ত। বিশ্বকর্মার নামে যন্ত্রপাতি পুজো। এইসব যন্ত্রপাতিই তাদের দক্ষশ্রমের ভরসা। বিশ্বকর্মার নামে তারা প্রতি বছর একবার করে মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে নেয়। বিশ্বকর্মা তাদের অন্নদাতা, তাদের অক্ষত এবং সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার ভাগ্যবিধাতা। বিশ্বকর্মা আরও কুশলী শ্রমিকে পরিণত করার পথপ্রদর্শক। এই দেবতার তুলনায় অন্য সব দেবতাই তাদের কাছে তুচ্ছ।

আমি বিস্মিত হই। বিরাট সেন্টিমেন্টের ব্যাপার। সবার সঙ্গে মিশে অরিন্দম ওঁদের মনকে চিনে ফেলেছে।

আমি সম্মত হয়ে যাই এবং একটি মিটিং ডেকে বলি—এবারে পুজো হবে। আপনাদের কাছ থেকে যতটা টাকা উঠবে, ঠিক ততটাই কম্পানীর তরফ থেকে দেওয়া হবে। এতে যদি আমার আর অরিন্দমের অসুবিধে হয় হোক।

ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সবাই। তারা বলে—কোনো অসুবিধা হবে না। বাজার দেখুন শুধু। মাল যেন ঘরের মধ্যে না জমে যায়।

ওরা আপ্রাণ পরিশ্রমে উৎপাদন বাড়িয়ে দিতে চায়। অরিন্দমের মুখে খুশীর হাসি ফুটে ওঠে।

মিটিং-এর পরে আমি আর অরিন্দম অফিস ঘরে গিয়ে বসি। গরমে

নিচু চালার অফিস ঘরে বসে থাকা কষ্টকর। ইচ্ছে আছে কিছু টাকা পেলে কারখানার সঙ্গে সঙ্গে অফিস ঘরেরও সংস্কার করব নেব। ছাদটা উঁচু হলে একটা সিলিং ফ্যানের ব্যবস্থা করা যাবে। এখন একটা ছোট টেবিল ফ্যানে কোনোমতে চলে। দিগম্বর জুটিয়ে দিয়েছে এটি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেট থেকে।

অরিন্দম উসখুস করে এক সময় বলে—আচ্ছা, ওই সুচরিতা দেবীর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি রকমের?

প্রশ্নটা করতে অরিন্দমকে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছে বুঝতে পারি। হেসে বলি—কেন বলতো?

—এমনিতে। আমার তেমন কৌতূহল নেই জানবার। তবে ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে এখানে আসেন। তাই বলছিলাম।

—সম্পর্কটা অতি সাধারণ। কোনো মধুর-টধুর ব্যাপার নয়।

—ব্যস্, তবে ঠিক আছে।

অরিন্দম থেমে যায়। সে ছেদ টেনে দিতে চায়। কিন্তু আমি পারি না। বলি—তোমার কি অন্যরকম সন্দেহ ছিল?

—না। তোমার চোখ-মুখ দেখে তেমন সন্দেহ হয় নি আমার। কিন্তু ভদ্রমহিলার যেটুকু কথাবার্তা শুনেছি তাতে মনে হয়েছে তুমি যেন তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ কেউ। তা ছাড়া এভাবে ফ্যাক্টরীতে আসা অস্বাভাবিক নয় কি?

—সে তো বটেই।

—কর্মীদের মধ্যেও আলোচনা হয়। তবে দেখেছি তোমার সম্বন্ধে তাদের খুব উঁচু ধারণা। ওরা বলাবলি করে, ভদ্রমহিলা জাল ফেলার চেষ্টা করছেন।

—সত্যি? জানতাম না তো?

—তোমার সামনে বলবে নাকি?

—তোমার সামনে বলে কেন তবে?

—আমার সামনেও বলে না। আমি অন্যভাবে জেনেছি। দু'একজনকে

নিজের লোক করে নিয়েছি।

—পলিটিক্স ? গোষ্ঠীতন্ত্র নাকি ?

অরিন্দম হেসে ওঠে। বলে—না। বরং বলতে পারো সেসব জিনিস যাতে এখানে মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে তার প্রচেষ্টা, আশেপাশে কতো ছোট বড় কারখানা আছে। ছোঁয়াচ লাগতে পারে। এ এক ধরনের ভাইরাস ইনফেক্সান। তাই প্রতিষেধক নিতে হয় আগে-ভাগে।

—বাঃ, বেশ বলেছ তো? কথাটা আমিও ভেবেছি। তবে এভাবে নয়। কিন্তু তোমার নিজের লোকেরা প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠার জন্যে মিথ্যে কথা তোমার কানে ঢালবে না তো ?

—না। আমি কারও অনিষ্ট চিন্তা করি না। ওদের মরেল যাতে উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকে সেই দিকে দেখার চেষ্টা করি। জানি না, সফল হবো কিনা। কারণ এ আমার হাতেখড়ি।

—আমার ধারণা তুমি সফল হবে। যা হোক সুচরিতা সম্বন্ধে ওরা আর কিছু বলে নাকি ?

—না। ওরা বলে জাল ছিঁড়ে বার হয়ে আসার হিম্মত তোমার আছে।

—শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে অরিন্দম। তোমাকে খাইয়ে দেব।

—কবে ?

—আজ ?

—না। আজ আমার একটা নেমন্তন্ন রয়েছে। কাল।

—হ্যাঁ। কোথায় খাওয়াবে ?

—আমার বাড়িতে।

—কি খাওয়াবে ?

—যা বলবে।

—প্রোটিন। আমার শরীরে ও জিনিষটার বড্ড অভাব। ডাইরেক্ট প্রোটিন।

—বেশ তো। মানু আর সুখেন সেদিন বললই তো ভারতবিখ্যাত দোকান রয়েছে কসবায়।

একটু পরে অরিন্দম নিজে থেকেই বলে—সুচরিতা দেবীর কথা কেন তুললাম, জানতে চাইলে না তো ?

—তুমি তো বললেই। আবার কি জানব ?

—না। আমি ভাবতাম সম্পর্কটা তোমার তরফ থেকে মধুরতায় না পৌঁছোলেও অপর পক্ষ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তাই কালকে একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠেছিলাম !

—চমকে উঠেছিলে ? তাহলে পল্টুর সেই বিশ্বকর্মা ঠাকুরকে দর্শনের মতো লোমহর্ষক ব্যাপার বল ? দৃশ্যটা কি ?

—আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কাল গঙ্গার ধারে গিয়েছিলাম। ম্যান-অব-ওয়ার জেটির কাছে বেঞ্চির ওপর ওঁকে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে যেভাবে বসে থাকতে দেখলাম তাকে দৃষ্টি-রুচিকর বলা যায় না।

—সত্যি ? নতুন খবর। তুমি চিনতে পেরেছ ? ভুল হয় নি ?

—কখনই না।

—তোমাকে দেখতে পেয়েছে ?

—না। আমাকে দেখার মতো অবকাশ তাঁর ছিল না।

—এতদূর ? তা ভদ্রলোকটি কে ?

—অচেনা। তবে বেশ রইস আদমি। মোটা আর একটু বেঁটে হলেও ধব্‌ধবে গায়ের রঙ। বড় চুল। ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি। একটা ফিয়েটগাড়ি রয়েছে ক্রীম কালারের।

—কি করে বুঝলে ?

—পরে ঘুরে এসে দেখি দুজনে ওই গাড়িতে করে নর্থের দিকে চলে গেলেন।

হাঁফ ছেড়ে বলি—যাক বাঁচলাম।

—কেন ?

—আমার এখানে আর জ্বালাতে আসবে না।

—তা বটে।

দুদিন বাদে দিগম্বর খুব উচ্ছ্বসিত অবস্থায় কারখানায় এলো।

অফিস ঘরে ঢুকেই বলে উঠল—খবর শুনেছিস ?

—কিসের খবর ?

—ব্রতচারিণী ব্রত-ভঙ্গ করেছেন ?

—সেই মহীয়সী মহিলাটি কে ?

—সুস্মিতা দেবী। তোর সুচরিতা দেবীর অগ্রজা। তিনি আবার এক-জনকে জুটিয়েছেন শুনলাম। নার্সারী স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। শিগ্‌গিরই নাকি বিয়ে ওদের।

—কিন্তু ভাগ্যবানটি কে ?

—প্রখ্যাত ব্যক্তি। আশাশ্রী সিনেমা হলের মালিক।

—রণেন মুস্তাফী ?

—হ্যাঁ। তুই-ও চিনিস দেখছি। রণেন ওরফে মিণ্টু।

আমার আনন্দ নিমেষে উধাও হয়ে যায়। বলি—কিন্তু সে তো ভালো নয়। সে কি সত্যিই বিয়ে করবে বলেছে ?

—নিশ্চয়ই বলেছে। নইলে এত চোট খেয়েও সুস্মিতা কেন ভিড়বে ওর সঙ্গে ? কিন্তু তোর মুখ শুকিয়ে গেল কেন অমন ? সুস্মিতার জন্যে চিন্তায় পড়লি নাকি ?

আমার চোখের সামনে মিণ্টু মুস্তাফীর চেহারা ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দমের দেখা গঙ্গার তীরের ভদ্রলোকের চেহারা আর তার ক্রীম রঙের ফিয়েট গাড়িখানার কথা মনে পড়ে গেল।

আমি অস্থির ভাবে বলে উঠি—না না। তুই ঠিক বলছিস না।

দিগম্বর বোধহয় আমার হাবভাবে অবাক হয়। সে বলে—কি হলো তোর ? আমি বেঠিক বলতে যাব কেন ? তুই যেন বড়ই উতলা মনে হচ্ছে ?

—আচ্ছা, সুস্মিতার চেহারার সঙ্গে সুচরিতার চেহারার কি খুব মিল রয়েছে ?

—মোটেই না। সুস্মিতার গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। সুচরিতাকে কখনই ফর্সা বলা যায় না।

—তাছাড়া ? আর কোনো অমিল আছে ?
—যথেষ্ট। সুস্মিতার মুখ গোল, সুচরিতার লম্বাটে।
—তাহলে ?
—কি হয়েছে ? পরিষ্কার করে বল্ না।

আমি গঙ্গাতীরের ঘটনার কথা বলি দিগম্বরকে। সে শুনে হো হো করে হেসে ওঠে। আমি বিরক্ত বোধ হলেও তাকে থামিয়ে দিতে পারি না। দিগম্বর বলে—মিণ্টু টা চিরকালের ধুরন্ধর। ও হচ্ছে শাঁখের করাত। সুস্মিতা এবারে পুরোপুরি ব্রহ্মচারিণী না হয়। সুচরিতার দেখা পেলে ফাঁস করে দেব।

—না না। ওসব কিছু করতে যাস নে। ওদের সমস্যা ওরা মিটিয়ে নেবে। ছেলেমানুষী করে নাক গলাতে যাস না। খুব খারাপ হতে পারে।
—বেশ। তুই যখন বলছিস। কিন্তু তোর সেই বম্বেওয়ালীর খবর কি? অনেকদিন দেখছি চুপচাপ।
—ওসব বাদ দে। কারখানা নিয়েই নিশ্বাস ফেলার সময় পাই নে।

দিগম্বরকে হয়ত সবই বলতাম। কিন্তু ওর ওই বম্বেওয়ালী কথাটা আমার বুকে অগ্নিবাণের মতো বেঁধে। আমার অনাগ্রহে ও হয়তো ভেবে নেয় সাময়িক মোহ কেটে গিয়েছে।

দিগম্বর চলে যাবার পরে সুচরিতার কথা ভাবি। এতটা জঘন্য কি সে হবে ? নিজের বোনের প্রেমাস্পদকে ভাঙিয়ে নিতে চাইবে ? নইলে মিণ্টু মুস্তাফীর সঙ্গে গঙ্গার তীরে ওভাবে বসে থাকার অন্য কোনো অর্থও তো হয় না।

সুচরিতা একদিন গুটি গুটি অফিস ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন অরিন্দম ছিল না সেখানে। আমি মুখ তুলে একবার তাকে দেখে নিয়ে নিজের কাজে মন দিই।

সে বলে—দীপ্তেন, আমি জানতাম তোমার কাছে একদিন এই ধরনের

অভ্যর্থনাই পাবো। তবে তোমার হিতৈষী বলে বার বার ছুটে না এসে পারি না।

ইচ্ছে হলো বলি যে, মিণ্টু মুস্তাফীর কাছে চোট খেয়েছে কিনা। কিন্তু মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারলাম না। কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে বলি—দাঁড়িয়ে রইলে কেন। বসো এসে।

সে বসে বলে—তোমার দুপাশে দুটি কুগ্রহ এসে জুটেছে। তারাই তোমার মন আমার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলছে।

—সেই দুটি কারা?

—তুমি ভালভাবেই জানো। একজন দিগম্বর, অপরটি তোমার সাধের আলতাদি। সেদিন তাই আমার ঠিকানা দেবার ইচ্ছা ছিল না।

—না দিলে ভালই করতে। গিয়ে কোনো কাজ হয় নি।

—হবে না জানতাম। তবে আমার সর্বনাশ নিশ্চয় করেছে যেটুকু পারে।

—না। বরং আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। সেদিন লাউডন স্ট্রীটে ও আমাদের দেখে ফেলেছে।

এতক্ষণে সুচরিতার মুখে উৎসাহ ফুটে ওঠে। সে বলে—সত্যি? তাই বুঝি হিংসায় জ্বলে মরছে?

—না না। হিংসা নয়। শুভেচ্ছা, বিদায়ের আগে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

সুচরিতা প্রথমে কিছু বলতে পারে না। তারপর ভেবে নিয়ে বলে—হতে পারে। যাওয়ার আগে শত্রুতা করতে চায় না। মেয়েটা এককালে ভালোই ছিল।

—এতক্ষণে ঠিক বললে।

—তোমার দ্বিতীয় নম্বর কুগ্রহ কিন্তু এখনো প্রবল।

হেসে বলি—সে প্রতিমাসে একবার করে অন্তত আসবেই। ভাড়া ফেলে রাখতে পারে না।

—লোকটা শয়তান। ওকে এড়িয়ে চল দীপেন।

—ওকে এড়িয়ে চলতে পারব না সুচরিতা। ব্যবসার লেন-দেনও কিছু

হয় ওর সঙ্গে!

—সর্বনাশ। ও তোমাকে ধ্বংস করবে বলে দিচ্ছি।

—আমি অতটা কাঁচা নই।

—না না। আমি ওকে ওখানে দেখতে চাই না। দিদিকে যেভাবে অপমান করেছিল, এখনো ভুলতে পারি না।

আমি ফস্ করে বলে ফেলি—তোমার দিদির নাকি বিয়ে?

সুচরিতার মুখ রক্তশূন্য হয়ে ওঠে। সে বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে—কোথায় শুনলে?

—কে যেন বলল।

—কে বলেছে? অমন বোকা সাজার চেষ্টা করো না। কে বলেছে বল।

সুচরিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। উত্তেজনায় তার নাকের ডগা ফুলে ফুলে ওঠে।

—অমন করছ কেন? কথাটা সত্যি কিনা বললেই তো চুকে যায়।

—হ্যাঁ। দিদির বিয়ে। কিন্তু সেটা বাজারে রটল কি করে? আবার পেছনে লেগেছে কেউ নিশ্চয়। কে বলেছে বল।

—ওই শয়তানটা।

চিৎকার করে সুচরিতা বলে—আমি বলেছি তোমাকে দূর করে দাও ওকে। শুনছ না। আজই দূর করো।

—ও আমার চাকর নয়। তাছাড়া অন্যায় তো করে নি। একটা খবর দিয়েছে শুধু। শুভ সংবাদ।

—না না না।

—শোন সুচরিতা। মাথা গরম করো না।

—ও জানলো কি করে?

—তোমার পরিচিত কোনো মেয়ের বিয়ে হলে তুমি জানতে পার না?

—তার মানে?

—তার মানে হলো খুব সহজ। মিণ্টু মুস্তাফী দিগম্বরের জানা-শোনা

াক।

চরিতার মুখ এবারে ছাই-এর মতো সাদা হয়ে যায়। সে হয়ত ভাবে, গম্বর তাই দিদির কীর্তিকাহিনী মিণ্টুকে বলে দেবে।

ামি বলি—দিগম্বরকে বলে দিয়েছি তোমার বোনের কোনো কথা যেন াক্ষরেও মিণ্টুকে না বলে দেয়। খুব কড়া ভাবে বলেছি।

-তোমার কথা শুনতে ওর বয়ে গিয়েছে।

-শুনতে বাধ্য। সাবধান করে বলেছি, নইলে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

-বন্ধু বিচ্ছেদ? শয়তানটার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছ নাকি?

-সে তো আজকের কথা নয় সুচরিতা। ইস্কুল থেকে সে আমার বন্ধু।

ফিস্‌ফিস্ করে সুচরিতা আপন মনে বলে—ইস্কুল থেকে? ইস্কুল থেকে? , তাই বল। আমি তাহলে যাই।

-কেন?

-না। আমি যাই।

-শোন। আরও একটা কথা যাতে দিগম্বরও না জানতে পারে সেই বস্থাও করেছি।

য়ে ভয়ে সুচরিতা আমার দিকে তাকিয়ে বলে—কোন্ কথা?

-গঙ্গার ধারে ম্যান-অব-ওয়ার জেটির পাশে বেঞ্চির ওপর তুমি আর ণ্টু যেভাবে বসেছিলে সেইকথা।

ট্‌কে বার হয়ে যায় সুচরিতা। জানলা দিয়ে দেখি সে ছুটতে ছুটতে লেছে। বুঝতে পারি আমার জীবন থেকে বরাবরের মতো সরে গেল । আসল কুগ্রহ।

াদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ ঝড় উঠল। কালিঘাটের গণেশ কাটরার কাছে সে আর এগোতে পারি না। ধুলোয় ঢেকে গেল চারদিক। দু-একটা নের চালাও ভেঙে পড়ল সেই ঝড়ের দাপটে। কয়েক মিনিটের জন্যে াম-বাস্ বন্ধ হয়ে গেল। কালিঘাট পার্কের কাছে একটা গাছ উপড়ে

পড়তে দেখলাম। তবে সেটি রাস্তায় না পড়ে পার্কের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

এর পরই শুরু হলো বর্ষণ। উপায় না দেখে একটা দোকান ঘরের সিঁড়িতে আশ্রয় নিলাম। আমার মতো আরও চার পাঁচজন সেইটুকু জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল। কারণ সিঁড়ির ওপরে ছাউনি ছিল। বেশী ভিজতে হবে না।

যাচ্ছিলাম অরিন্দমের বাড়ি। সে নিমন্ত্রণ করেছে। একদিন তাকে ভর-পেট প্রোটিন খাইয়েছিলাম। আজ শোধ-বোধ হবে। অরিন্দম অবশ্য সেভাবে কথা বলে নি। বলেছিল—মাসীমার রান্না আমি খেলাম। উপাদেয়। কিন্তু আমি তোমাকে নিজের রান্না খাওয়াব।

—বিশ্বাস করি না।

—বেশ। তোমার সামনেই রেঁধে দেখাব। ওসব ট্র্যাডিশানাল কিছু নয়। রীতিমত নতুন ধরনের।

—মুখে দিতে পারব তো? অনস্বাদিত-পূর্ব খাবার বলছ যখন।

অরিন্দম হেসে উঠেছিল।

তাই সন্ধ্যার সময় যাচ্ছিলাম তার বাড়ির দিকে। পথে আটকে গেলাম প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

আমরা সবাই জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার উপায় নেই। দিনের বেলা হলে দেখতে পেতাম। ছেঁড়া মেঘ দেখে পুলকিতও হতে পারতাম। কিন্তু এই গাছপালায় ছাওয়া রাস্তার ফাঁক-ফোকর দিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে কিছুই বোঝা যাবে না। তাই রাস্তার বাতিগুলোর সামনের দিকে ঝকঝকে বৃষ্টির ধারা হতাশা ভরা চোখে লক্ষ্য করতে শুরু করলাম।

—একটু সরে দাঁড়াবেন?

আমার সামনে একজন তরুণী দাঁড়িয়েছিলেন প্রথম থেকেই। তাঁরই অনুরোধ এটি। গায়ে ঝাপ্‌টা এসে লাগছে। অথচ পেছনে এক সেন্টি মিটার জায়গা আছে কিনা সন্দেহ।

আমি বলি—জায়গা নেই একটুও। আপনি বরং আমার জায়গায় আসুন।

—না থাক।

খুবই স্বাভাবিক এই উত্তর। আমার পক্ষেও অনুনয় করা অশোভন। চুপ করে থাকি।

সেই সময় আবার এক ঝাপটা। আমি ভিজে যাই। তরুণীর অবস্থা কল্পনা করতে পারি। একদিকে হেলে তাঁকে বলি—এখানে আসুন। আমার বাড়ি কাছেই।

বিনা বাক্যে তিনি জায়গা বদল করে নেন। সেই সময়ে তাঁর মুখের দিকে নজর পড়ে।

মানসী।

মানসীও আমাকে চিনতে পারে। তার স্বাভাবিকতা মুহূর্তে উধাও হয়। সারা মুখে বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ে। পারলে তখনি চলে যেত। বৃষ্টির জন্যে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে থাকে। সে বুঝতে পারে তাকে মিথ্যে কথা বলে পেছনে জায়গা করে দিয়েছি। আমার বাড়ি অনেক দূরে।

তার বিরক্তি গায়ে না মেখে হেসে বলি—মিথ্যে কথা সব সময়ে দোষের নয়। যদি জানতাম আপনি তাহলে বলতাম না।

সে কোনো জবাব দেয় না। মুখ ঘুরিয়ে নেয় অন্যদিকে। তার হাবভাব লক্ষ্য করে আমিও আর কিছু বলি না। শুধু ঝাপটাগুলো গায়ে মেখে নিজেকে ভিজিয়ে তুলি।

কিন্তু আমার ভেতরেও তখন ছোটখাটো একটা ঝড় উঠেছে। মানসী বলতে পারবে আলতাদির কথা।

সাহস হয় না জিজ্ঞাসা করতে। যেরকম বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছে, মনে হয় আলতাদি কলামন্দিরের সামনে আঁচল টানার কথা বলে দিয়েছে ওকে।

আমার গা দিয়ে জল গড়াতে থাকে। মাথা শুকনো থাকলেও শরীরের অর্ধেকটা সিক্ত। রুমাল নিংড়ে বারবার মুছেও সুবিধে হয় না।

মানসীর বোধহয় সংকোচ হচ্ছিল। জায়গা বদল করে আমাকে ভিজিয়ে দিল—বাকী সবাই দেখল। তাই বলে একসময়—আপনি এখানে আসুন।

—না। এই তো বৃষ্টি থেমে যাচ্ছে।

মিনিট পনেরো পরে বৃষ্টি থামে। ফুটপাথে জল ওঠে না। গ্রীষ্মকালের বৃষ্টি বলেই বোধহয়।

আমরা আশ্রয় ছেড়ে রাস্তায় নামি।

মানসী বলে—ধন্যবাদ।

ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া মেয়ে। মুখের ভদ্রতায় কোনোরকম গাফিলতি নেই।

কিছু বলি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলি। মানসী অস্বস্তি অনুভব করে। বলে—আমার সঙ্গে আসছেন কেন?

—এমনি। বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

—কোনো প্রয়োজন নেই।

—আলতাদি ভালো? আপনাদের নীলা?

—জানি না।

—আমার ওপর আপনার ঘৃণার পেছনে কোনো কারণ নেই কিন্তু।

—আপনি চলে যান।

—যাচ্ছি। শুধু আলতাদির খবরটা জানতে চাই। এতে কোনো দোষ নেই। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে মানসী বলে—আপনি কি মানুষ? ভেবেছেন, আমি কিছু জানি না?

বুঝলাম, আঁচল টানার ঘটনা। চুপ করে থাকি। কিছুদিন আগে হলেও একথা কাউকে বলতো না আলতাদি। আর বললেও, এমনভাবে নয় নিশ্চয়ই। তাতে মানসীর মুখে একটা বিরক্তির বদলে আনন্দ প্রকাশ পেত।

মানসী বলে—সুচরিতাকে ছেড়ে দিয়ে আবার নীলার দিকে ঝুঁকতে

চাইছেন বেহায়ার মতো ? ওকে কি ভাবেন আপনি? সস্তা স্ত্রীলোক ?
আমি কঠোর হয়ে উঠি। বলি—দেখুন সুচরিতাকে আমি ছাড়ি নি কিংবা ধরি নি। এ প্রশ্ন ওঠে না। আপনার কাছে জবাবদিহি দেবার প্রবৃত্তি আমার নেই। আর আপনাকে আমি এতই কম গুরুত্ব দিই যে আপনার অপমানকর কথাবার্তাতেও কিছু এসে যায় না।
—তাহলে চলে যান এখুনি। আমার পেছনে পেছনে আসছেন কেন ? আপনার এই ধরনের ব্যবহার কোন্ শ্রেণীর কথা মনে করিয়ে দেয় জানেন না ?
—জানি। কুকুরের কথা। এক দিক দিয়ে কথাটা ঠিক। যদি বিশ্বস্ত-তার কথা ওঠে তবে আমি কুকুরের সমপর্যায়ের। সেই বিশ্বস্ততা আলতা-দির প্রতি।
—ইস্। বিশ্বস্ততা। এতই বিশ্বস্ত যে ভয়ে নীলা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেল।
—কি বললেন ? ভারতবর্ষ ছেড়ে গিয়েছে ?
—হ্যাঁ।
—কবে গেল।
—পরশু।
—কোথায় ? উগাণ্ডায় ?
—তাছাড়া আবার কোথায় ?
আমার হৃদয় যেন ভেঙে যায়। বলি—মানসী দেবী, আলতাদি তো অনেক দূর চলে গেল। আমি খুব খারাপ হলেও, ওর আর কোনো ভয় নেই। আপনি অনুগ্রহ করে তার ঠিকানা আমাকে দেবেন !
—কখনই না। মরে গেলেও নয়। সে বারবার নিষেধ করে গিয়েছে।
—সে ভুল ধারণা নিয়ে গিয়েছে। আমি বুঝিয়ে লিখলে তার ধারণা পাল্টাবে।
—না। আবার তাকে কোনো প্রতারণার মধ্যে ফেলতে চাই না। অনেক ভুগেছে সে। অত নরম প্রকৃতির মেয়েকে আমি আর ভুগতে

দিতে চাই না। আপনি চলে যান।
—আজ আপনি রেগে আছেন। পরে একদিন গিয়ে দেখা করবো।
মানসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠে
—না না। আপনি সে চেষ্টা করলে, আপনাকে গলা ধাক্কা খেতে হবে।
দু'একজন লোক ছুটে আসে মানসীর চিৎকারে। তারা মানসীকে প্রশ্ন করে—কি হয়েছে বড়দি? জ্বালাতন করছে? রোমিও হতে চায়? বলুন একবার, আড়ঙ ধোলাই কাকে বলে দেখিয়ে দিই।
—না। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। এমন কিছু নয়।
তবু ভালো।
আমি পেছন ফিরে অরিন্দমের বাড়ির দিকে রওনা হই।

জীবনের দুটি প্রদীপ। একটি অন্তরের অপরটি বাইরের। মনে হলো অন্তরের প্রদীপটি নিভে গেল। তাই বাইরের প্রদীপটিকে উজ্জলতর করার সাধনা পেয়ে বসল আমাকে। আলতাদিকে বলেছিলাম, তাকে শেষবার দেখার চিত্রটি মনের পটে স্থায়ীভাবে এঁকে নেব। সেটাই হবে আমার অনুপ্রেরণা। অথচ চোখে আঁচল চেপে তার কলামন্দিরে ঢুকে যাওয়ার ছবিটি আমাকে উৎসাহ দেবার বদলে কাঁদাতে চায় এখন।
তবু ভুলতে হবে বলেই ভুলে যেতে চাই। কাজের মধ্যে নিজেকে একেবারে সঁপে দিই। আলতাদি আমায় কারখানাকে কটন মিলের পর্যায়ে উন্নীত করার স্বপ্ন দেখিয়েছে।
ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমার কাজকর্মে সন্তুষ্ট। কারণ নিয়মিত ভাবে তাদের ধার শোধ করে চলেছি। ব্যাংকের লোকেরা বলে, এটা নাকি এক বিরল দৃষ্টান্ত। ওরা আমাকে বাকী দশ হাজার টাকা দিতে দ্বিধা বোধ করবে না।

তারপর কয়েকমাস কেটে যায়। ব্যাংক থেকে টাকা পেলাম। কারখানার উৎপাদন অনেক বেড়ে গেল। লাভ হতে থাকল প্রচুর। সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দমের সাহায্যে কর্মীদের প্রতিনিধি নিয়ে একটা কমিটি গড়ে তুললাম। সবার দায়িত্ব সমান হবে, এটাই আমার পরিকল্পনা সুচনা থেকেই। অরিন্দম তাতে উৎসাহ পায়। কিন্তু দিগম্বর এতে কিছুতেই সায় দিতে পারে না। বারবার সন্দেহ প্রকাশ করে। ওর বাবা বলেছেন ভবিষ্যতে ভুগতে হবে আমাকে। কারণ শ্রমিকদের চাহিদা আকাশ-ছোঁয়া। আমি মুখে কিছু না বললেও, মনেমনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস দুচার বছরের মধ্যে সারা দেশেই এই ধরনের ব্যবস্থা হবে। পৃথিবীর আহ্নিক আর বার্ষিক গতির মতো সমাজ ব্যবস্থার এও এক অনিবার্য গতি। একে থামিয়ে দেওয়া যায় না। একে অস্বীকার করা মূঢ়তা। যারা একে অস্বীকার করতে চায় তারা অনেক নোংরা কাজ করে, অনেক অবিচার করে। কারণ স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে যেতে হলে অস্বাভাবিক কিছুকে অবলম্বন করা ছাড়া পথ থাকে না। স্বাভাবিকতাকে তড়িঘড়ি বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে অনেক দেশে খুন খারাপি হয়েছে বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে একটা সুনির্দিষ্ট পথে কোনোরকম রক্তপাত না ঘটিয়ে কিছু করা হয়তো অসম্ভব নাও হতে পারে।

আমার কারখানা আরও বাড়ালাম। একটা বড় শেড তৈরি করলাম। ইচ্ছে আছে, খুব শিগ্‌গির পুরোনো চালাঘরকে বাতিল করে দেব। এতে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা তেমন নেই। কর্মীদের পরিশ্রম বেশী হয়। হাওয়া চলাচলের ভালো ব্যবস্থা করতে পারলে উৎপাদন নিঃসন্দেহে আরও কিছু বাড়বে।

দিগম্বর, তার বাবার ভবিষ্যৎবাণী কতটা ফলছে দেখার জন্যে নিয়মিত কারখানায় আসে আর সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। সে নিজেই নিজেকে আমার অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে। কিছুদিন এইভাবে পর্যবেক্ষণের পরে তার ভেতরে একটা পরিবর্তনের সুচনা লক্ষ্য করি। একদিন তাকে বলি—কিরে, এত কি দেখিস?

—বলব ?

—বলবি বৈকি।

—আমার মনে হয় তুই ঠিক পথই বেছে নিয়েছিস। তোর এখানে সবার মধ্যেই এক অদ্ভুত উৎসাহ দেখি। এরা যেন শুধু নিজেদের সংসারের জন্যে কাজ করছে না। বাড়তি কিছু একটা আছে। জানি না, শেষরক্ষা করতে পারবি কিনা।

হেসে বলি—দেখা যাক।

তারপরই হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে একদিন বলে—সুচরিতাকে দেখেছিস এর মধ্যে ?

—না তো ?

—সেই যেদিন আমার আর তোর সম্পর্ক জানলো, তার পরেই বন্ধ করে দিয়েছে আসা।

—হ্যাঁ। তারপরে কেউ আসতে পারে ?

—আমি দেখলাম তাকে লেক মার্কেটের কাছে। বিশ্বাস করা যায় না। কালই দেখলাম।

—কেন ? কি হয়েছে ?

—একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। কি রকম যেন উদ্‌ভ্রান্ত ভাব।

—অসুখ-টসুখ করেছিল নাকি ?

—কি করে বলব ? একবার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞাসা করি। সাহসে কুলোলো না। ও ধীরে ধীরে ফুটপাথ ধরে বাঁয়ের একটা গলির মধ্যে চলে গেল। ভালো লাগলো না। চোট খেল নাকি ?

—কার কাছে খাবে ?

—মানুষের কি অভাব আছে? ওর দিদি তো আবার চোট খেয়ে গেল।

—কেন ? মিণ্টু বিয়ে করবে না ?

—মাথা খারাপ ?

—মিণ্টুর সঙ্গে কথা হয়েছে নাকি তোর ?

সুচরিতার সঙ্গে মিণ্টুর গোপন সম্পর্কের কথা আমি দিগম্বরকে বলতে

পারি নি। কেন পারি নি জানি না। হয়ত নিছক অনুকম্পা।

দিগম্বর বলে—ওর সঙ্গে আমার এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা নেই। তবে রাস্তা-ঘাটে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ঘুরতে দেখি তাকে। মেয়েটি উঠতি নায়িকা। দুটো বই-এ নেমেছে।

ভাবি, সুস্মিতা নার্শারী স্কুলেব চাকরিটা কখনই ফিরে পাবে না। এবারে কি করবে সে ?

আমি জানি সুস্মিতা আর সুচরিতার প্রসঙ্গ উত্থাপনের পরই দিগম্বর আলতাদির কথা তোলে। মাঝে কিছুদিন বন্ধ রেখেছিল সযত্নে, কারণ তখন সে বুঝেছিল আলতাদি আমাকে দাগা দিয়েছে। তারপর যখন দেখল যে আমি বেশ স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছি অর্থাৎ তার 'বম্বেওয়ালির' সম্বন্ধে প্রশ্ন বেশ সহজভাবে দিয়ে শুরু করলাম, তখন আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাঝে মাঝে আমাকে বাজিয়ে নেয়। সে বোধহয় দেখতে চায় আলতাদির প্রভাব আমার কারখানার বারোটা বাজাবার পক্ষে যথেষ্ট কিনা।

এদিনও ব্যতিক্রম হলো না। কারণ সে বুঝে ফেলেছে একদিন আমার মনের মধ্যে দগদগে ঘায়ের সৃষ্টি হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন সেই ঘা শুকিয়ে তার দাগ অবধি মিলিয়ে গিয়েছে। দিগম্বরকে আমি পরের ঘটনাবলীর কথা জানাতে পারি নি।

আজ প্রশ্ন করতেই আমি বলি—সে চলে গিয়েছে চিরদিনের মতো।

—তার মানে ? চিরদিনের মতো মানে ?

আমি ভাবি, একজনকে অন্তত সব কিছু বলা উচিত। আর দিগম্বরের চেয়ে উপযুক্ত কে-ই বা আছে পৃথিবীতে যার কাছে আমি সব কিছু বলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। একা একা মনের মধ্যে পুষে রেখে রেখে এক এক সময় বিচলিত হয়ে উঠি।

একে একে সব কিছু বলি ওকে। তার উগাণ্ডা যাওয়ার ঘটনার কথাও বাদ দিই না।

অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারে না আমার আবাল্য বন্ধু। বোধহয় ভাবে,

না জেনে আমাকে ক্রমাগত নিষ্ঠুরের মতো আঘাত দিয়ে গিয়েছে। সে টেবিল থেকে কাঁচের পেপার ওয়েট তুলে নিয়ে তার এয়ার-বাবল-এর মধ্যেকার বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে। শেষে বলে—আমার কাছে কেন গোপন করলি তুই ?

—তুই হয়ত ভাবতিস ছেলেমানুষী—ভাবাবেগ।

—সেকথা এখনো ভাবছি। ভাবাবেগ তো বটেই। তবে এক একজনের ভাবাবেগের স্থায়িত্ব এক এক রকমের। তোর স্থায়িত্ব যতটুকু আলতাদির স্থায়িত্ব তার চেয়ে অনেক কম। তাই সে চলে গিয়েছে।

—না না। আমার এখন সন্দেহ হয় সুচরিতা তার মন ভাঙিয়েছে।

—সন্দেহ কেন। নিশ্চয়ই তাই করেছে। আমাকে তুই আগে বললে এর একটা উপায় বার করতে পারতাম। আমি হচ্ছি ব্যবসায়ীর বংশ। প্র্যাকটিক্যাল। অত মান অভিমানের ব্যাপার ভাই আমার মধ্যে নেই। আমি হলে সুচরিতাকে টানতে টানতে নিয়ে যেতাম আলতাদির সামনে। সামনা সামনি প্রমাণ করে দিতাম।

—আমি অতটা বুঝতে পারি নি।

—আমি হলে গোড়াতেই পারতাম। শোন দীপু, এতেই প্রমাণ হয়ে গেল তুই আমাকে বন্ধু বলে মানিস না।

– না ভাই। ঠিক তা নয়। তোকে এখন বোঝাতে পারবো না। তবে আমি কখনো কল্পনা করি নি আলতাদি চলে যাবে। তাই চুপ করে ছিলাম। এতে কি গায়ের জোর খাটে ?

—অনেক সময় প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে যখন অপর পক্ষের ভাবাবেগের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

—তার মানে ?

—তোর আলতাদির মন যদি ঠিক তোরই মতো হতো, তাহলে সুচরিতার কথায় সে বিশ্বাস করতে পারত না। সে বন্ধুর সুখের পথে কাঁটা না হয়ে সরে যাবার মহত্ত্বটুকু নিয়ে বিদায় নিল। আমি একে মহত্ব বলি না।

আমি দিগম্বরের উক্তিতে অবাক হই।

দিগম্বর বলে—আমার কি মনে হয় জানিস?

—কি?

—তোর আলতাদি কিছু দিনের মধ্যে তোকে স্রেফ ভুলে যাবে। আফ্রিকান কোনো সুসন্তানকে বিয়ে করে ঘর বাঁধবে।

বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে ওঠে কথাটা শুনে। বলি—ওখানে চিরকাল থাকতে হলে বিয়ে করতে পারে বৈকি।

—হ্যাঁ। তাই করবে দোস্ত। এ বিষয়ে যদি কিছু সন্দেহ থেকে থাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও।

—চেষ্টা করছি। চেষ্টা তো করতেই হবে।

—ওভাবে চেষ্টা করলে হবে না। চেষ্টার একটা প্রক্রিয়া আছে।

—প্রক্রিয়া?

—হ্যাঁ। সব জিনিষেরই একটা প্রক্রিয়া রয়েছে।

—এ প্রক্রিয়াটা কি?

—একজন বৌদি কিংবা বৌমাকে ঘরে আনা।

দিগম্বর সব কিছুকে লঘু করে দেবার জন্যে প্রাণ খুলে হাসতে থাকে। আমি পারি না। অথচ হাসা উচিত ছিল। কারণ আলতাদি সম্বন্ধে আমার মনোভাব যা-ই হোক না কেন, আমার সম্বন্ধে তার মনোভাব কোনোদিন তেমন ভাবে পাই নি। আমার মা-ও এ ব্যাপারে কোনো রকম মন্তব্য করেন না। তিনি আলতাদির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছেন হয়তো।

সেদিনের কলামন্দিরের সামনে আলতাদির আঁচল-চাপা মুখখানার কথা ভুলতে পারি না। কেন সে কাঁদল? নিশ্চয়ই আঘাত দিয়েছিলাম তাকে। একজন অতি সস্তা আত্মমর্যাদাহীন স্ত্রীলোককেও প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথের ওপর আঁচল ধরে টানা খুব সহজ ব্যাপার নয়। অথচ আমি তাই করেছিলাম। কথাটা ভাবলে কেমন একটা যন্ত্রণা অনুভব করি। এই যন্ত্রণা দিনের বেলায় না হোক, রাতে আমাকে স্থির

থাকতে দেয় না। স্বপ্নে অনেক সময় চোখের জল ফেলি।
স্বপ্ন আমাকে শুধু দুঃখ দেয়, তা নয়। আনন্দও দেয়। কতো রাতে স্বপ্ন দেখি লেকের সেই মাঠে আলতাদির সঙ্গে ক্রিকেট খেলছি। আমি আর আলতাদি। এই আলতাদি দুঃখ জানে না, শোক জানে না। এই আলতাদি গম্ভীর হতে জানে না। মিষ্টি হাসতে জানে শুধু। একদিন খেলতে খেলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কোথায় যে খেলছি জানি না। আশেপাশে জনমনিষ্যি নেই। খেলতে খেলতে একদিন ব্যাট ফেলে রেখে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরে বলে—তুমি কি বোকা। আমি বুঝি শুধু ক্রিকেট খেলতেই আসি? বুঝতে পার না কেন? আমার সেই চিঠি তো রেখে দিয়েছ—ভালো করে পড়েছ কখনো?
চমকে জেগে উঠি একদিন। ঘড়িতে আড়াইটে। আর ঘুম হয় নি বাকী রাতটুকু। ভাবলাম আমি বোকা বৈকি? আমি যদি দিগম্বরের মতো চালাক হতাম তাহলে আজ আর তাকে সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে জীবিকা অর্জনের জন্যে পাড়ি দিতে হতো না।

যত দিন যায় মনে মনে অস্থির হয়ে উঠি। এতদিনে যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারি, আলতাদি ছাড়া জীবন কাটানো দুঃসহ হবে। এমনও হতে পারে, কারখানার প্রতিও আমি বীতস্পৃহ হয়ে উঠতে পারি।
মনে মনে ঠিক করি, যেভাবে হোক আলতাদির ঠিকানা খুঁজে বার করতে হবে। মানসী না দিক অন্য কোথাও মিলবে। নিখিলেশ বাবুর কাছেই যাব। তিনি হয়ত তাড়িয়ে দেবেন। তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।
কিংবা আলতাদির বাবা অলকেশ বাবুর কাছে গেলে কেমন হয়? তিনি পাষণ্ড, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু বাবার প্রতি মেয়ের রক্তের একটা টান থাকে। সেই টানের বশে হয়তো সে অলকেশবাবুকে চিঠি দিয়েছে।
আমি ঠিকানা জানি না। শুধু জানতাম তিনি গুরুসদয় রোডের কোনো

এক বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন। যে কম্পানীতে চাকরি করেন, সেই কম্পানীর নামও জানা নেই। তবে গুরুসদয় রোডের বাড়ির সংখ্যা খুব বেশী নয়। রোজ অল্প অল্প করে খোঁজ করলে মিলে যেতে পারে এক দিন। অন্য কোনো পথ যেন খোলা নেই।

বাড়ির জানালার ধারে বসে এই কথা ভাবছিলাম, আর মনে মনে সংকল্প করছিলাম আজই কারখানা থেকে ফেরার পথে খোঁজ শুরু করব। রোজ এইভাবে খুঁজব। ঠিক সেই সময় পিয়ন এসে জানলা দিয়ে একটা চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে যায়। চিঠিখানা আমার বুকে লেগে মাটিতে পড়ে। আমি বিস্ময়ে সেই দিকে চেয়ে থাকি। এয়ার মেলের চিঠি। কে লিখবে? কেউ নেই বিদেশে। শুধু আলতাদি। ছোঁ মেরে সেটি তুলে নিই। হ্যাঁ, আলতাদি।

তাড়াতাড়ি উঠে ছুরি দিয়ে খামটা খুলে ফেলি। দীর্ঘ চিঠি। সেটি পড়ার আগে ঠিকানার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠি।

নেই। ওপরে নিচে কোথাও ঠিকানা দেওয়া নেই। বুঝতে পারি, আলতাদি চায় না আমি তাকে চিঠি লিখি। আমার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে সে। তবু কেন লিখল? বোধহয় ভদ্রতাসূচক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। লেগ ব্রেক বলের মোহ তার কেটে গিয়েছে। এই ঠিকানাবিহীন চিঠিখানা আঁকড়ে ধরে বলতে ইচ্ছে হলো—আলতাদি, ইট্‌ ইজ নট্‌ ক্রিকেট।

আমি পড়তে শুরু করি :

দীপ্তেন দা,

ভাবছ আমি খুব অকৃতজ্ঞ। বাঙলা ভাষায় আমার খুব বেশী দখল নেই। থাকলে, ঠিক ভাবে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারতাম। শুধু এইটুকু জেনে রেখো, আজ যে আমি পৃথিবীর একটি কোণে জায়গা পেয়ে নিজের মতো জীবন কাটাতে পারছি—এ তোমারই দান। জনক রোডে সেই সন্ধ্যায় আমার হার-ছড়াটা তোমার হাতে তুলে দেবার স্পর্ধা কেন হলো আজও ভেবে পাই না। আমার বোধহয় মাথার ঠিক

ছিল না। ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে তোমার কষ্টের অর্থ দিয়েছ বলে সুচরিতা কোনো সময়ে তোমার ওপর দোষারোপ করতে পারে। আমি নিজে হীন বলেই একথা মনে হয়েছিল। সুচরিতা অমন মেয়ে কখনই নয়। আমার মনের ওপর তখন ছিল অপরিসীম চাপ। তাই অমন অন্যায় কাজ করে ফেলেছিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করো দীপ্তেনদা। তোমার ক্ষমা আর আশীর্বাদের মূল্য আমার কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো।

আমি এখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে থাকি। যতক্ষণ ওদের মধ্যে থাকি আমার খুব ভালো লাগে। সব দেশের শিশুরাই এক। জাতি ধর্ম বর্ণ—এ সব হলো বাইরের জিনিষ। শিশুদের মনে এ-সবের কোনো ছাপ থাকে না। সব শিশুই দেবশিশু।

তুমি শুনলে হাসবে আমি ওদের আমাকে আলতাদি বলে ডাকতে শিখিয়েছি। ওরা তাই বলে ডাকে। শুনতে কী মিষ্টি লাগে। এই নতুন ভাষার ডাক ওরা কতো সহজে শিখে ফেলল। আমার কাছে শিখেছে বলে উচ্চারণ একেবারে আমাদের মতো।

মানসীর চিঠিতে জানলাম, ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল। চিঠি পড়ে মনে হলো, তোমার সঙ্গে ও ভালো ব্যবহার করে নি। ও আমাকে খুব ভালোবাসে। তাই বোধহয় অমন করে ফেলেছে। তুমি কিছু মনে করো না। তোমার সঙ্গে আমার কলামন্দিরের সামনে দেখা হবার ঘটনা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। সেদিন তুমি বড্ড ছেলেমানুষী করে ফেলেছিলে। অমন কখনো করতে হয়? সঙ্গে সুচরিতা থাকলে কি ভাবত? আমি জানি তুমি খাঁটি। কিন্তু পৃথিবী মানুষের মন জানতে চায় না। পৃথিবী দেখে বাইরের ব্যবহার।

সুচরিতার প্রতি আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ শুধু একটি কারণে, বম্বে থেকে ফিরে জনক রোডের বাড়িতে উঠলে, পাড়ার পরিচিত কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে নি। যাঁরা আমাকে স্নেহ করতেন বলে জানতাম, তারা একবারও এসে খোঁজ নেন নি। অথচ তাঁদের মধ্যে অনেকেই বম্বের সিনেমা জগতে সুযোগ পাই বলে আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

পাড়ার ছেলে-মেয়েরা, যারা একদিন আমার মুখের দুটো কথা শুনতে আশেপাশে ভিড় করত, তারাও আমাকে দেখলে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিত। সেই দুঃসময়ে একমাত্র সুচরিতাই আমার বাড়িতে এসেছে। এতেই প্রমাণ হয় যে, সে আমাকে ভালবাসে। সে আমার বন্ধু। সেদিন তাকে আমার বড় ভালো লেগেছিল। আর তখনই জানলাম তোমাদের কথা। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যি বলছি। সুচরিতার মতো মেয়েকে ভুলিয়ে ফেললে? তুমি সত্যিই কীলার।

এই চিঠিখানা সুচরিতা নিশ্চয়ই দেখবে। কারণ এতদিনে সে তোমার সুখদুঃখের অংশীদার বলে ভেবে নিচ্ছি। মেয়েটি খুব ভালো। আমার বন্ধু বলে একথা লিখছি না। তোমাদের জীবন সুখের হোক।

তোমার কারখানার খবর কি? কটন্ মিল হওয়া চাই কিন্তু। কোনো-দিন হয়ত দেখব উগাণ্ডার বাজারে তোমার মিলের কাপড়। ভাবতেই কত ভালো লাগছে। তখন আমি সব ফেলে সেটি কিনে নেব। ব্লাউ-সের কাপড়ও তৈরি করবে কিন্তু। তাহলে অন্য মিলের কাপড় আমাকে কিনতেই হবে না। তাড়াতাড়ি হওয়া চাই। মানুষের জীবন—কবে ফুরিয়ে যাই ঠিক কি?

তোমাদের আমার ঠিকানা জানালাম না। জানিয়ে কি হবে? আমি তো কলকাতার কেউ নই। কলকাতায় আমার মা ছিলেন, ঠাকুমা ছিলেন। তারা চলে যাবার পর থেকে আমি একা। বাবার জন্যে মাঝে মাঝে বড় দুঃখ হয়। উনি শান্তি পাবেন না। শেষ জীবনে ওঁকে দেখার কেউ রইল না। মিসেস্ ত্রিবেদী শেষ পর্যন্ত ওঁকে ঠকিয়েছেন। বিয়ে না করে পাঞ্জাবে চলে গিয়েছেন। মাঝখান থেকে আমাকে ছিন্নমূল করে গেলেন।

দেশে কখনো ফিরলে বাবার জন্যেই ফিরতে হবে। নইলে আর ফিরব না। এইভাবেই জীবন কাটিয়ে দেব। জানি না এখানকার সরকার বরাবরের জন্যে আমাকে রাখবে কিনা।

তোমার আশীর্বাদ কামনা করি। সুচরিতার কল‍্যাণ আমার কাম্য। মাসীমাকে আমার আন্তরিক প্রণাম জানিও।

প্রণতা
আলতা

আলতা।

আলতাদি নয়।

চিঠিখানা কতোক্ষণ হাতে ধরে বসেছিলাম জানি না। একসময় দেখি মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন পাশে। আমার হাত নিশ্চয় কাঁপে নি। তবে চোখ-মুখ স্বাভাবিক ছিল কিনা বলতে পারি না। কারণ সুচরিতা আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে।

মা বলেন—সেই মেয়েটির চিঠি নাকি রে?

মা ঠিকই ধরেছেন। আলতাদি সম্বন্ধে সম্প্রতি কোনো আলোচনা না করলেও এককালে খুবই কথাবার্তা হতো মায়ের সঙ্গে।

বলি—হ্যাঁ মা। আমাদের দুজনার জীবন আর একটি মেয়ে চক্রান্ত করে নষ্ট করে দিল।

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে মা বলেন—জীবন কি অতোই ঠুনকো যে একটু ধাক্কা খেলে খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়বে? তুই খেয়ে দেয়ে নে। কারখানায় যা। আর চিঠিখানা আমাকে দিয়ে যাস।

—তুমি নেবে?

—হ্যাঁ। দরকার আছে।

মায়ের কণ্ঠস্বরে কি ছিল জানি না। মনে হলো, তিনি যেন সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। আমি মায়ের ভক্ত বলে, বন্ধুদের অনেক টিট্‌কারী অনেক বিদ্রূপ সহ্য করেছি। এক একসময় মনে হয়েছে সত্যিই বুঝি আমি চিরকালের নাবালক। তবু মা আমার অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন। যে সব বন্ধুরা ষোল বছরেই নিজেদের অতিরিক্ত নাবালক ভাবত, তারা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে জলখাবার খেয়ে ঘরে বসতেই মা এসে বলেন—

মেয়েটির বাবা কোথায় থাকেন রে ?

—জানি না। গুরুসদয় রোডের কোথাও। কেন ?

—তিনি ঠিকানা জানেন মেয়েটির।

—কি করে বুঝলে ?

– বাবার সব খবরই রাখে সে।

—তুমি ঠিকই বলেছ মা।

—মেয়েটির বাবা এমন কেন ? এই বয়সে—ছি ছি।

—তিনি কেমন সেকথা জেনে কি হবে ?

—না কিছুই হবে না। সমাজে এক ধরনের মেরুদণ্ডহীন প্রাণী থাকে বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না।

– আমি আলতাদির ঠিকানা যদি পাই তাহলে কি করব ?

—চিঠি লিখে দিবি। লিখবি ওই যে কি নাম মেয়েটার ?

—সুচরিতা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। লিখবি, সুচরিতার সঙ্গে তোর বিয়ে হয় নি। হবেও না।

—সে তো লিখবই। সুচরিতার আসল রূপ প্রকাশ করে দেব।

—অতটা দরকার নেই। চিঠি কখনো অসংযত ভাবে লিখতে নেই।

—বেশ। সংযত ভাবেই লিখব। কিন্তু তাতে লাভ ?

—লাভ আবার কি ? মেয়েটি চলে আসবে কলকাতায়।

—কেন আসবে ? কার জন্যে আসবে ?

মা হাসেন। বলেন—মায়ের মুখ থেকেই কথাটা শুনবি ? তোর জন্যেই আসবে। লিখে দে।

আমি মায়ের দিকে চেয়ে থাকি।

—অমন পাঁঠার মতো তাকিয়ে আছিস কেন ? ওর বাবাকে খুঁজে বার কর।

গুরুসদয় রোড তন্নতন্ন করে খুঁজতে অনেক ভদ্রলোকের বাঁকা কথা অনেক দারোয়ানের ধমক খেয়ে শেষে চতুর্থদিনে অলকেশ বাবুর সন্ধান

মিলল।

দরজার বেল টিপতেই একজন প্রৌঢ় হতশ্রী ভদ্রলোক এসে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোককে দেখতে অলকেশ বাবুর মতোই। আমি কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁকে একবার মাত্র দেখেছিলাম জনক রোডে। সেই একবারের দর্শনেই মনের মধ্যে একটা গভীর ছাপ পড়ে গিয়েছিল। এই ভদ্রলোক তাঁর বড় ভাই হতে পারেন। কিন্তু আলতাদি কখনো বলে নি, তার কোনো আত্মীয় স্বজন রয়েছে।

—কাকে চাই?

—আমি অলকেশবাবুর কাছে এসেছিলাম।

—আমিই অলকেশবাবু।

—আপনি।

চমকে উঠলাম বৈকি। কারণ সেই সুদর্শন চেহারার ছায়াও অবশিষ্ট নেই। এমনও হয়!

—হ্যাঁ আমি।

তাড়াতাড়ি নমস্কার সেরে আমি বলি—আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছিলাম।

—অফিসের কোনো কাজে?

—না। ব্যক্তিগত।

উনি 'ব্যক্তিগত' কথাটাকে বারকয়েক বিড়বিড় করে আওড়ালেন। তারপর বলেন—আমার কাছে ব্যক্তিগত কারণে কখনো কেউ তো আসে না।

—আমি এসেছি। আমাকে আপনি একদিন কয়েক মুহূর্তের জন্যে জনক রোডের বাড়িতে দেখেছিলেন।

ভদ্রলোকের মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে যায়। ওঁর চোখদুটো সন্দেহে কুঞ্চিত হয়।

আমি বলি—ঘরে বসে সামান্য দুচারটে কথা বলতে পারি?

—ভাড়া তো আমি নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া ও বাড়ি আমি

ছাড়ব না। ওখানে আমার জিনিসপত্র আছে। কিছু স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে ওখানে। আমার মেয়ে এখন বিদেশে। সে ফিরে এলে আমি নিজেও ওখানে চলে যাব।

—আপনার মেয়ের ব্যাপারেই আমি এসেছি।

ভদ্রলোকের সর্বশরীর ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। ঘনঘন শ্বাস টেনে উনি বলেন —নীলা? সে ভালো আছে তো? তার কোনো খবর এসেছে নাকি? আপনি সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে এসেছেন?

—আপনি অনর্থক চিন্তা করছেন। আপনার মেয়ে ভালই আছে। আমরা দুজনে পরামর্শ করে তাকে ফিরিয়ে আনব বলে এসেছি।

—আপনি সিনেমা কোম্পানীর? না না, তাহলে আর পরামর্শের দরকার নেই।

এবারে লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে বলি—আপনি বুঝি ভুলে গেছেন আমাকে। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। একদিন আপনার মেয়ে আমাকে আপনাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। ক্রিকেট খেলতে গিয়ে আমাদের পরিচয়। আমার ধারণা ওকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারব।

—ফিরিয়ে আনতে পারবেন? মানে, নীলা আপনাকে পছন্দ করে?

—আমার মা তো সেই কথাই বললেন। তাঁর ধারণা আমি চিঠি দিলে ও ফিরে আসবে।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন। তারপর আমার হাত চেপে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে যেতে বলেন—এসো। দেখি তোমার কতখানি জোর। তোমাকে আমি ঠিকানা দিচ্ছি। আমি শুধু চাই ও ফিরে আসুক। ও ফিরে এলেই আমি শান্তি পাব। আর কিছু না। যদি তুমি ওকে ফিরিয়ে আনতে পার তাহলে—তাহলে—

ভদ্রলোক কথার খেই হারিয়ে ফেলেন।

আমি ওঁকে মোটামুটি সব কিছুই বলি। তারপর ঠিকানা নিয়ে বাড়িতে ফিরি।

সেই রাতেই আলতাকে চিঠি লিখতে বসলাম। ভেবেছিলাম অনেক

বড় করে চিঠি দেব। সব কথা জানাব। তাকে ফিরে আসার জন্যে আকুলভাবে অনুরোধ করব। কিন্তু সেভাবে লিখতে পারলাম না। চিঠিও খুব বেশী দীর্ঘ হলো না। মা যতই বলুন আলতা ফিরে আসবে, আমি ভরসা পাই না। সে আমার কাছে এখনো স্পষ্ট নয়।

লিখলাম :

আলতা,

এই পত্র হয়তো তোমার বিরক্তির কারণ হবে। তুমি চাও নি আমি তোমায় চিঠি দিই, কিন্তু তোমার ঠিকানা আমি জানি।

বিশেষ কারণে লিখতে হলো। তুমি মস্ত ভুল ধারণা নিয়ে দেশ ছেড়েছ। সেই ধারণা যাতে না থাকে, তাই তোমার বাবার কাছ থেকে ঠিকানা নিতে হলো। তোমার বাবাকে খুঁজে বার করতে কয়েকদিন দেরী হয়ে গেল।

তুমি সুচরিতা সম্বন্ধে যে-ধরনের মন্তব্য করেছ, তাতে আমি অবাক হয়েছি। ব্যথা পেয়েছি আরো বেশী। সুচরিতার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। তুমি যখন বম্বেতে গিয়েছিলে সেই সময় একদিন জনক রোডে গিয়ে তোমার খোঁজ করার সময়ে সুচরিতার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে তার মাসীর বাড়ির একতলার জানলা দিয়ে আমাকে ডেকেছিল। তারপর থেকে সে কিছুদিন আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। আমার কারখানায় গিয়েও কয়েকবার হানা দিয়েছে। আমি বিরক্ত হই একথা বুঝতে চাইত না। কেন এমন করত জানি না। মনে হতো, আমি ছাড়া ত্রিভুবনে তার আর কেউ নেই।

তোমার মনে আছে কিনা জানি না, লেকে প্রথমে তোমার নাম শুনে তোমার রূপের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় বলেছিলাম, নামটি সার্থক। তখন সুচরিতাও বেশ কড়া ভাবে বলে উঠেছিল যে তার নামটিও সার্থক। তাই তুমি বম্বে থাকার সময়ে সে যেভাবে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল তাতে বিচলিত বোধ করেছিলাম। তোমাকে সেই সব কথা বলে ব্যথা দিতে চাই নি। তাছাড়া সময় পেলাম কোথায়?

বম্বে থেকে ফেরার পরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তুমি তো ভালভাবে কথাই বললে না। সেদিন আমার অনেক কিছু বলার ছিল। তারপর তুমি যখন মানসীদের ওখানে থাকতে তখনো এসব কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। তখন আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল যে সুচরিতাই তোমার মন ভাঙিয়েছে। কিন্তু এত অল্পেই তোমার মন কেন ভাঙল আলতা? আমাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলে না কেন?

আলতা, তোমাকে শুধু একটি আবেদনই করব। তুমি ফিরে এসো। তুমি এলে তোমার বাবা শান্তি পাবেন।

কটন মিল করার সাধ আপাতত আমার নেই। যে ভাবে চলেছি সেই ভাবেই চলব। আমার উচ্চাশা নেই। উগাণ্ডার বাজারে শাড়ি বিক্রি হয় কিনা জানি না। বিক্রি হলেও সে-সব শাড়ি মিলের সাধারণ শাড়ি নয়। তোমার সাধারণ শাড়ি যাতে পরতে না হয়, সেই জন্যেই কটন মিলের সাধ আমার মিটে গেল।

আলতা, তোমাকে এই নামে আমি হাজার বার ডাকতে পারি। আমাকে তুমি অনুমতি দিয়েছ। কিন্তু চিঠিতে কতবার এই নাম লেখা যায়? শুধু লিখেই কি তৃপ্তি পাওয়া যায়? ডাকার অনুমতি দিলে যখন, সুযোগ দেবে না?

ইতি

দীপ্তেনদা

চিঠিখানা খামে ভরে সুন্দর ভাবে ঠিকানা লিখে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ি। ওই ঠিকানা যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্যে আমি আমার নোট বই-এর পাতায়, ক্যালেণ্ডারের পেছনে লিখে রাখি। আর হারাতে দেব না।

সহজে ঘুম আসে না। মা সংযত ভাবে লিখতে বলেছেন। যথেষ্ট সংযত হয়েছি সুচরিতা সম্বন্ধে। কিন্তু নিজের মনের কথা কিছুই বলা হলো না। চাপতে চাপতে সবই চেপে গেলাম। লিখতে বসে এক এক সময়ে মনে হয়েছে একটা বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে। সেই বিস্ফোরণ আমার মনকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ঘটে নি। মনের

বাইরের আবরণ শক্ত লোহার খোলসের মতো ভেতরের আলোড়নকে ভেতরেই রেখে দিয়েছে। বাইরে বার হতে দেয় নি। বিস্ফোরণও হয় নি। তাই তৃপ্তি পাই না। জানি, হাজার পৃষ্ঠা লিখেও তৃপ্তি পেতাম না। আমার ফ্যাক্টরী আমাকে বিচলিত হতে দিল না। নইলে আলতার জবাবের জন্যে তীব্র প্রতীক্ষা আমাকে পাগল করে দিতে পারত। কিন্তু ফ্যাক্টরীতে এমন একটি ঘটনা ঘটল যে অন্য সব চিন্তা থেকে আমার মন বিমুক্ত হয়ে গেল।

একদিন ভোর বেলা বাড়িতে খবর এলো কারখানার দুটো মোটরই চুরি গিয়েছে। ওখানে তিন শিফ্‌টে কাজ হয় না অন্যান্য বড় বড় ফ্যাক্টরীর মতো। রাতের বেলা কাজ বন্ধ থাকে। তবে লোকজন থাকে। দু তিন জন অদক্ষ শ্রমিক রাতে পাহারাদারের কাজও করে। কিভাবে চুরি হলো আমার মাথায় আসে না। মোটর দুটি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ছিল। দাম সস্তা ছিল। টাকার অঙ্কের দিক দিয়েও বিরাট কিছু নয়। কিন্তু এখন কর্মীরা বসে থাকলে আর কারখানা না চললে খুবই ক্ষতি। তা ছাড়া ওর পরিবর্তে তাড়াতাড়ি মোটর আনতে হলে নতুন ছাড়া গতি নেই। তাতে কয়েক হাজার টাকা খরচের ধাক্কা।

অরিন্দমও খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলো। তার চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট। আমি দেখেছি এই কারখানাকে সে ঠিক প্রাণহীন যন্ত্র হিসাবে ভাবে না। যেন এর জীবন আছে। এর যেন অনুভূতি আছে। অরিন্দমকে অনেক সময় দেখেছি কোনো যন্ত্র কোথাও সামান্য চোট খেলে সে সেইখানে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয়। অদ্ভুত অনুভূতিপ্রবণ সে। এই তীব্র অনুভূতিই মানুষকে বোধহয় সাদা চোখের আয়ত্তের বাইরের আর এক জগতের সন্ধান দেয়।

অরিন্দম এসেই প্রশ্ন করে—কি মনে হয়?

—কাউকে সন্দেহ করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

—আমিও তাই। রাতে মোটর চুরির কোনো সম্ভাবনা নেই। দরজার দুটো তালাই বন্ধ ছিল।

—তখন বাইরের কেউ এসে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ?

—না। তাই অবাক হচ্ছি।

—পুলিশে খবর দেব কি ?

—দেবে ?

—তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।

অরিন্দম খুব বিচলিত হয়। বুঝলাম সে চায় না ঝট্ করে পুলিশে খবর দিতে।

দিগম্বরকে খবর পাঠিয়েছিলাম। সে এসেই বলল—ফ্যাক্টরীতে বিভীষণ আছে। শিগ্‌গির পুলিশে খবর দে। তুই দানছত্র খুলে বসিস নি। এই ফ্যাক্টরীর আয়ে তোদের সংসার চলে। তেমনি আরও কর্মীরও চলে। এখানে ওই সব দয়ামায়ার স্থান নেই।

তবু আমি সময় নিলাম একদিন। আমার কমিটির মিটিং ডাকলাম। অবাক হলাম দেখে যে সবাই দিগম্বরের সন্দেহকেই ঠিক বলল। সবাই গম্ভীর ভাবে বলল, কারখানার কেউ একাজ করেছে। বাইরের কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

ওদের সন্দেহ আমাকে বিষণ্ণ করে তোলে। বুঝতে পারি, আমার ভেতরের আদর্শবাদ আমাকে বাস্তব দিকটা অনেক সময়েই ঠিকমত যাচাই করতে দেয় না। ওদের কথা যদি সত্যি হয়, প্রতিকারের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে কারখানার প্রতিটি শ্রমিককে সামনের খোলা জায়গাতে জড়ো হতে বললাম।

ওরা এসে জড়ো হলে আমি স্পষ্ট বলি—আমাদের মধ্যে যদি কেউ এ-কাজ করে থাকে স্বীকার করুক। স্বীকার করলে আমি পুলিশের দ্বারস্থ হবো না। এ-কাজ যে করেছে সে খুবই অন্যায় করেছে। আমার দৃঢ় ধারণা, সে কোনো প্রলোভনে পড়ে এ-কাজ করেছে। যদি টাকার জন্যে করে থাকে, তাহলে জেনে রাখুক ধরা সে পড়বেই। আর ধরা পড়লে আমি তাকে বাঁচাতে যাব না। আইন তার নিজের পথ করে নেবে। কারণ এই ছোট্ট কারখানার বিরাট ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতের

সঙ্গে আমাদের. প্রত্যেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে রয়েছে। এই কারখানা যত বড়ই হয়ে উঠুক, এখন আমরা যারা এখানে রয়েছি তারা প্রত্যেকেই সক্ষম শরীর যতদিন থাকবে, ততদিন এখানেই থাকব। কোনো কারণে হঠাৎ অশক্ত হয়ে পড়লে তারও ব্যবস্থা আমরা করেছি—একথা কারও অজানা নয়। আমরা সবার মতামত নিয়ে সবার পছন্দ মতো একটি নিয়ম তৈরি করেছি। তাই একে পেছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টা করলে কেউ সহ্য করব না।

অরিন্দম বলে—এটা পেছন থেকে ছুরি মারাই বটে। তবে আমার ধারণা যে এ-কাজ করেছে সে ভাবতেই পারে নি যে অতটা খারাপ কাজ সে করেছে। কারণ সে নিশ্চয় চায় না কারখানা বন্ধ হয়ে যাক।

আমি বলি—একটা প্রস্তাব রয়েছে আমার। হয়তো এ প্রস্তাব সমর্থন করবে না কেউ। আমি প্রস্তাব করছি, এই ভুল যে করেছে সে যেন আমার বাড়িতে মোটর দুটি নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসে। আমি তার নাম প্রকাশ করব না। কারণ সে যদি দিয়ে আসে আমি বুঝব সে চোর নয়। সে ভুল করে ফেলেছিল মাত্র।

একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আমার প্রস্তাব হলো, তার পরিচয় প্রকাশ করে দিতেই হবে। নইলে আমরা সবাই সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করব।

অরিন্দম বলে—আমিও এটি সমর্থন করছি। দীপ্তেনবাবু তাঁর কোমল মনের পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন।

সেই সময় হঠাৎ সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে স্পিনিং-এর বনমালী হাজরা উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমি—আমি চোর। আমি নিয়েছি ওই দুটো। তোরা আমার মুখে থুথু দে—থুথু দে। আমি ফ্যাক্টরীর পেছনে লুকিয়ে রেখেছি। কেন নিয়েছি তোরা জানিস। আমার সাত ছেলে মেয়ে। সংসার চলে না। তাই বলে, চুরির ক্ষমা নেই। তোরা আমাকে ধরে মার। আমাকে লাথি মার।

কিছুক্ষণের নীরবতা নেমে আসে বনমালী ভেঙে পড়ার পরে।

আমিই ভঙ্গ করি নীরবতা। বলি—এখন চুপ করে আছো কেন সবাই ? থুথু দাও, লাথি মারো ? আমি জানি পারবে না তোমরা। বনমালীকে সবাই যে ভালবাসো।

আমার কথার পরেও সবাই স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। আর বনমালীর দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সে বলে—আমি মরব। এ-মুখ তোদের দেখাব কি করে ? সারা জীবনে কখনো অন্যায় করি নি। এ দুর্মতি ভগবান আমাকে দিলেন কেন ? তোরা আয়। দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন ? আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেল্।

তবু কোনো সাড়া জাগে না।

তখন অরিন্দম কঠোর স্বরে বলে—পিটিয়ে যদি না মারতে পার, বুকে তো টেনে নিতে পারো।

আশ্চর্য ! এমন উল্টো ফল বোধহয় হয় না। বনমালীকে আলিঙ্গনের ধুম্ পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গুমোট ভাব কেটে যায়।

বনমালীকে এককালীন একটা ঋণ দেওয়া ঠিক হলো। বিনা সুদে প্রতি মাসে খুব সামান্য করে কেটে নেওয়া হবে।

এই ঘটনার সময়টিতে দিগম্বর উপস্থিত ছিল না। পরে শুনে বলে—তুই ঠিক করেছিস। একটা বিষয়ে তুই সফল হয়েছিস। মোটর কিনতে হয় নি নতুন করে। বনমালীকে সাহায্য দিয়ে তাই মোটের ওপর ক্ষতি হয় নি। তবে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল এটা। অন্য কর্মীরাও অসময়ে এই ভাবে চাইতে পারে। দিতে না পারলে অপ্রিয় হবি।

—দেখা যাক্। সাহায্য দেওয়া আর না দেওয়া আমার একার ওপর নির্ভর করছে না। কমিটি রয়েছে।

দিগম্বর আমার পরিচালন ব্যবস্থার মাঝে মাঝে মন্তব্য করে বটে, কিন্তু আমার কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করে নি কখনো। বরং খুব ঔৎসুক্য আর কৌতূহল নিয়ে আমার পরিচালনার ধরন-ধারণ পর্যবেক্ষণ করে যায়। আমি জানি সে আমার হিতৈষী। আমি এ কথাও জানি সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। দেশের আবহাওয়ার পরিবর্তন সে চোখ বন্ধ

করে থেকে না দেখার ভান করে না। তবে তাদের বংশপরম্পরায় ব্যবসায়ের যে ধারা সেই ধারার মধ্যে কোনোরকম নতুনত্ব আনতে ভরসা পায় না। কিংবা সে মনে করতে পারে, সেই ধারা অনেক দিনের ঝড়-ঝাপ্‌টা কাটিয়ে উঠেছে বলে বেশী গ্রহণযোগ্য।

মান্নু আর সুখেনের দল সত্যি সত্যি হকার দেবীর পুজো করে ছাড়ল। আমি অবাক হলাম মূর্তি দেখে। মুখে ওরা যে বর্ণনা দিয়েছিল হুবহু সেই প্রতিমা। ইলেকট্রিক ট্রেনের সামনেটুকু চমৎকার দেখতে হয়েছে। সামনে ইংরেজীতে লেখা আছে শিয়ালদহ। পুজোর উপচার আর উপ-করণের কোনো ত্রুটি নেই।

আর দেখলাম সবাই বেশ ভক্তিভরে প্রণাম জানাচ্ছে পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূতা এই দেবীকে।

মান্নু মাতব্বরদের মধ্যে একজন। সে আমাকে দেখে কাছে এসে হাসতে হাসতে বলে—কেমন দেখছিস দীপু?

—দারুণ।

—হুঁ হুঁ, বলেছিলাম না? সারা শিয়ালদহ হাওড়ায় রটে গিয়েছে। সুখেন গিয়ে পোস্টার মেরে দিয়ে এসেছে স্টেশনের দেয়ালে দেয়ালে, ট্রেনের গায়েও। আরতির সময় দেখবি ভীড়ের ঠেলা।

—আরতি কখন?

—কেন? সন্ধে বেলা। ঝেঁটিয়ে আসবে বুঝলি? সেই জন্যেই তো সামনে ওই তামার বিরাট থালাখানা রাখা হয়েছে। সুখেনের ওপর ওটির ভার। নইলে গ্যাঁড়া হয়ে যাবে সব পয়সা।

—খুব ভালো। অরিন্দম আসবে না?

—বিকেলে আসবে। সবাই বলছে কি জানিস?

—কি?

—পাঁচ বছরের মধ্যে এটা জাতীয় উৎসবে পরিণত হবে।

আমি হেসে ফেলি।

—হাসছিস? গভীরভাবে ভেবে দেখলে হাসতে পারতিস না ভাই। চাকরীর যা বাজার। শিক্ষিত বাঙালীর ছেলেরা রিক্সা-ঠেলা টানতে পারে না। কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতেও নাকি অনেক ব্যাপার-স্যাপার আছে। সুতরাং হকারী ভরসা। এককালে শুনেছি শহরের প্রতি ঘরে একজন করে কেরাণী থাকত। এখন থাকবে হকার। ফুটপাথের হকার, ট্রেনের হকার, লং-ডিসট্যান্স বাসের হকার। প্লেনে হকার থাকে নাকি রে?

—না। তুই তো জানিস থাকে না।

মানু হেসে ফেলে বলে—আমরা আন্দোলন চালাব প্লেনে হকারব্যবস্থা চালু করতে। দিদিমনিরা শুধু ভালো ভালো খাবার দেবেন তা চলবে না। ডালমুট, চ্যানাচুরও দরকার হয়। হয়ে যাবে। যা জাগ্রতা দেবী।

—চলি ভাই।

—আরতির সময় আসিস কিন্তু।

—দেখি।

—ওসব দেখি-টেখি নয়। আসতেই হবে। অন্তত ফাংসানের সময় আসা চাই-ই।

—ফাংস্যান আবার কখন?

—আরতির পরে। ওরা সব আসবে।

—আচ্ছা।

—আচ্ছা-টাচ্ছা নয়। আমি দেখব যাতে তুই আসিস।

মানুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি। আসলে মনটা আমার একটু উতলা। আমার চিঠি কি আলতাদি পায় নি? এতো দেরি হচ্ছে কেন জবাব দিতে?

অলকেশবাবুর কাছে ছুটে গিয়েছিলাম এর মধ্যে। তিনি আমাকে দেখে আগ্রহভরে প্রশ্ন করেছিলেন—চিঠি পেয়েছ? নীলা আসছে?

আমি সত্যি কথা বলেছিলাম।

তাঁর চোখের আলো মুহূর্তে দপ্ করে নিভে গিয়েছিল। ঘোলাটে দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন—পাবে না। সে আসবে না। তুমিও আনতে পারবে না।

তাঁর হতাশা দেখে আমার মন আরও দমে গিয়েছিল।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে শুনতে পেলাম হুকার দেবীর প্রাঙ্গনে মাইকে অনেক কিছু বলা হচ্ছে। গলাটা সুখেনের বলে মনে হলো। সে বলছে —বাঙলার লতা এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন। আপনারা ধৈর্য ধরুন। কলকাতার কিশোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বেন। গাড়ি গিয়েছে আনতে। আপনারা জানেন, তাঁদের মতো খ্যাতনামা শিল্পীদের আসরে নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। তবু আমরা এনেছি, আনতে পেরেছি, হুকার দেবীর আশীর্বাদে। বলুন হুকারদেবী জিন্দাবাদ।

সমস্বরে ধ্বনিত হলো—জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

আবার সুখেনের গলা—হ্যাঁ, এইবারে আমাদের সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হবে। প্রথমে যেমন শুক্তো দিয়ে খাওয়া শুরু হয়, এও তেমনি। মানে প্রথমেই আসল শিল্পীদের তো সামনে আনা যায় না। কারণ তাঁরা গেয়ে চলে গেলেই আপনারা ভেগে পড়বেন। হুকার দেবী তা চান না। তিনি চান সব বিষয়ে অচলা নিষ্ঠা। যাঁকে এবারে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য তিনি হুকারদেবীর আশীর্বাদে দুই বছরের মধ্যেই বাঙলার আশা হিসাবে নিজেকে পরিচিতা করার আশা রাখেন।

আমি রাস্তার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে সব শুনে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারি না।

বাড়িতে ঢুকে দেখি সব ঘর বন্ধ। মা নেই। অবাক হই। এমন কখনো হয়নি। আমি বাড়ি ফেরার সময় মাকে কখনো অনুপস্থিত দেখি নি।

—মা।

—পাবে না চাঁদ।

—কে ?

অন্ধকার থেকে মান্নু বার হয়ে আসে। বলে—এবারে চল ওদিকে। হারমোনিয়ামে আওয়াজ শুনছো না?

—মা কোথায় বল্ না।

—তিনি ওখানে আছেন। তুই না এলে কিছুতেই যেতে চান নি। তাই আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। মাসীমাকে বলেছি, জলখাবারের বদলে আমি তাকে প্রসাদ দেব। শেষে না পেরে মাসীমা গিয়েছেন।

—তোরা বড্ড বাড়াবাড়ি করিস।

—বটে। ছকে বাঁধা দিন চলছে বলে অনিয়ম বুঝি একটুও সহ্য হয় না? আমাদের অনিয়মটাই শিখবে।

—আমি তাই বলেছি? বাড়িতে এসে মাকে না দেখলে ফাঁকা লাগে।

—জানি। আমারও তেমন দিন ছিল। কবে যেন মিলিয়ে গেল। এখন বাড়ির কেউ সহ্য করতে পারে না। যাক্‌গে, ওসব কথা। তোর জন্যে কত বড় স্বার্থ ত্যাগ করেছি জানিস?

—স্বার্থত্যাগ আবার কি করলি?

—শুনলি না? সুখেন মাইকে কিরকম কপচে গেল? আমারই তো বলার কথা ছিল। এর পরে কিছু বললেও লোকে শুনবে নাকি?

সঙ্গীতের আসর ভালই জমল। মান্নুরা ঠিকই বলেছিল। এইসব গায়কদের বেশ একটা চাহিদা আছে বলে মনে হলো। তবে তারা মৌলিক কোনো গান গাইলে চাহিদা থাকবে কিনা বলা মুশকিল।

আশেপাশে তাকিয়ে মাকে খোঁজার অনেক চেষ্টা করলাম, পারলাম না। ভিড়ের মধ্যে মিশে রয়েছেন।

সুখেন এসে বলে—কেমন শুনছিস।

—চমৎকার।

—বলেছিলাম না? আমার বক্তৃতা শুনেছিস?

—কখন দিলি?

—সবার প্রথমে।

—ও। সেই গায়কদের সম্বন্ধে তো?

—হ্যাঁ। কেমন ছাড়লাম ?

—দারুণ।

—এসব হলো স্বতঃস্ফূর্ত, বুঝলি ?

—শুনে তাই তো মনে হলো।

—পরের বার আরও ইমপ্রুভ করব দেখিস। আমরা ভাবছি বিশ্বকর্মা-টাও লাগিয়ে দেব।

—অত ঘন ঘন লাগাস নে ভাই। আমাদের একটু টাইম দে।

—বলছিস্ ?

—নিশ্চয়ই। তাছাড়া সব দেবদেবীকে পুজো করলে তাঁদের কেউই সন্তুষ্ট হবেন না। সবাই ভাববেন, আমার চেয়ে আর একজনের বেলায় বেশী ধুমধাম হয়েছে। ওঁদের ভীষণ হিংসে। সবার অভিশাপ হজম করতে পারবি ?

—হুঁ। পয়েন্টটা ভেবে দেখার মতো।

আসর ভাঙলে মায়ের দেখা পাই। প্রথমেই প্রশ্ন করেন—খেয়েছিস ?

—হ্যাঁ। মানু অনেক খাইয়েছে।

—কেমন শুনলি ?

—তুমি কেমন শুনলে ?

—আমি আবার কি শুনব। ওদের সখ ডেকে নিয়ে এলো। তাই গিয়ে বসেছিলাম। নকল চিরকালই নকল। আসলের মর্যাদা পায় না। ওদের আসল হয়ে ওঠার প্রতিভা নেই বলে নকল করে। লোকে বোঝে না। হুজুগের যুগ তো!

রাস্তায় আসতে আসতে মা বলেন—একটা চিঠি এসেছে।

—অ্যাঁ।

—চিঠি।

—কার ?

—কার আবার। সেই মেয়েটার।

আমি অধৈর্য হয়ে উঠি মনে মনে। সুখেন আর মানুকে অভিশম্পাত

দিতে ইচ্ছে হয়

—পড়েছ। কি লিখেছে?

—পাগল হলি নাকি? খামের চিঠি আমি পড়তে যাব কেন?

বাড়ি ফিরেই মা চিঠিখানা হাতে দেন। আমি সেটি নিয়ে ঘরে রেখে হাত মুখ ধুতে যাই।

—পড়লি না?

—পরে পড়ব। যা খিদে পেয়েছে।

—তা জানি। খেয়ে দেয়ে চিঠিখানা পড়িস। কাল শুনব। তোর মুখে ওর রূপের যা খ্যাতি শুনেছিলাম, তাতে আমারও লোভ হয়েছে।

খেয়ে উঠে ঘরে গিয়ে চিঠি খুলি।

দীপ্তেনদা,

তোমার চিঠি পেয়ে মনে হচ্ছিল আমি স্বপ্ন দেখছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলাম সুচরিতা তোমার জীবনের সঙ্গে স্থায়ীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা তো নয়। তবে কেন সে এমন কথা বলল? সে যদি না বলত তবে তোমাকে যে আমি জনক রোডে অন্যভাবে অভ্যর্থনা করতে পারতাম।

তুমি কত কষ্টই না পেয়েছ। আমি শুধু কাঁদছি তোমার চিঠি পেয়ে। আজ এই মুহূর্তেও কাঁদছি।

আমি জানতাম, আমি খাঁটি হীরে খুঁজে পেয়েছি। সুচরিতার কথায় তাই নিজের ওপর প্রচণ্ড অনাস্থা এসে গিয়েছিল। তুমি জান না তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বম্বে থেকে পাগলের মতো কিভাবে ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু নিজে থেকে গিয়ে দেখা করতে পারলাম না। সুচরিতার মুখে সব শুনে পাথর হয়ে গেলাম। তুমি দেখা করতে এসে আমাকে সেই পাথরই দেখে গেলে।

দেশে আমার আর কোনো আকর্ষণ রইল না। তাই পালিয়ে এলাম। বড় ইচ্ছে ছিল, তোমার একখানা ফটো নিয়ে আসব। তোমার মুখ আমার মনের মধ্যে সব সময় স্পষ্ট। চোখ বুজলে দেখতে পাই। কিন্তু

চোখ খুললে মিলিয়ে যাও।

আমি কিছুই লিখতে পারছি না। হাত অবশ হয়ে আসছে। আমি ফিরে যাব। তোমার কাছে ফিরে যাব। আর কিছু লেখার ক্ষমতা আজ আমার নেই। তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ। বড় কষ্ট পাচ্ছ। তোমার জন্যে আমার যন্ত্রণার শেষ নেই।

আমি ফিরে যাব। সব ঠিক করে ফেলেছি। আসছে মাসের বারো তারিখে। আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। আমি গেলে তুমি আমাকে শাস্তি দিও। শাস্তি না পেলে শান্তি পাব না। এখন বুঝি কেন তুমি আমার আঁচল ধরেছিলে। তবু তোমার অব্যক্ত ব্যথা প্রকাশ করতে পার নি। হেসে রসিকতা করতে চেয়েছিলে।

এখানকার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে আমার বড় কষ্ট হবে। ওরা আমাকে বড় ভালবেসে ফেলেছে।

বাবার জন্যে খুব দুঃখ হয়। ভগবানের অশেষ দয়া যে তাঁর শাপমোচন হয়েছে। বাকী জীবন তিনি যেন শান্তি পান। তুমি আছো বলে কারও ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। সুচরিতার ওপরও নয়।

প্রণতা

তোমার আলতা

এই প্রথম আমার হাত কাঁপে। চিঠিখানাকে বারবার পড়ি। তবু শেষ হতে চায় না কিছুতে। মনে হয়, অক্ষরে যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী অর্থ লুকিয়ে রয়েছে এর মধ্যে।

চিঠিখানা পড়া শেষ হলে একবার ভাঁজ করি আবার খুলি। বারবার মনে হয় কিছু যেন বাদ পড়ে গিয়েছে। সেই সময় বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে মায়ের ডাক শুনি।

দরজা খুলে দাঁড়াতেই মা প্রশ্ন করেন—আসছে তো?

—এ্যাঁ।

—বলছি, মেয়েটা ফিরে আসছে তো?

—গম্ভীর হয়ে বলি—আসবে, সে তো জানতামই।

মা হেসে ফেলেন। বলেন—তাহলে লিখে দে আজই। লিখে দে. ওর কোনো দোষ নেই। সবই বিধিলিপি।

অবাক হয়ে বলি—তুমি পড়েছ নাকি চিঠিখানা।

—পড়তে হবে কেন? আমি জানি। এ চিঠি কি তুই আমাকে পড়তে দিবি?

দ্বিধার সঙ্গে বলি—না দেবার কি আছে?

—থাক। এটা পড়তে চাই না।

মা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ করে লিখতে বসি। অনেক কিছু লেখার আছে। তবু লিখতে পারি না। ভাষাও কেমন খাপছাড়া হয়ে যায়। মনের অস্থিরতা বোধহয় এর কারণ।

আলতা,

শাস্তি তোমার নয়, আমার পাওনা। আসলে আমি বোকা। মা আমায় মাঝে মাঝে গাধা বলেন। একটুও অতিশয়োক্তি নেই তাতে।

আমি বারো তারিখের জন্য আকুল প্রতীক্ষায় রইলাম। কিন্তু কখন আসবে বুঝতে পারছি না। আমি যে তোমাকে এয়ার পোর্ট থেকে নিজে গিয়ে নিয়ে আসব।

আমি কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারছি না। অথচ আমার চোখে জল নেই। কেন পারছি না জানি না। লিখতে বসে অনেক কথা জমা হচ্ছে মনের মধ্যে কিন্তু কলমের মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না। বারবার ব্যর্থ হচ্ছি।

আমি কালই তোমার বাবার কাছে যাব। খবরটা তাঁকে জানালে, খুবই আনান্দত হবেন।

ইতি

তোমার দীপ্তেন

অলকেশবাবু খবরটা শুনে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন। অত বড় একজন মানুষকে এভাবে কাঁদতে কখনো দেখি নি।

ভদ্রলোকের জন্যে অনুকম্পা জাগে মনে।

—তুমি আমাকে বাঁচালে দীপ্তেন। নতুন জীবন দিলে আমায়।
কথাটা শুনে ওই পরিবেশেও মনে মনে দুঃখের হাসি হাসতে হয়। কারণ উনি আমাকে যা বললেন হুবহু সেই কথা ওঁকেও আমি বলতে পারি। উনি আমাকে আলতার ঠিকানা না দিলে সে চিরকালের জন্যে আমার জীবন থেকে, ভারতের মাটি থেকে সরে যেত। আলতা আমাকেও নতুন জীবন দিতে চলেছে।
একটু পরেই ভদ্রলোক উঠে পড়েন। নিজেই হিটার জ্বালিয়ে কফি তৈরি করতে বসেন। মাঝে মাঝে হাসতে থাকেন। সেই হাসি থেকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বার্ধক্যের ছাপ অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত।
অলকেশবাবুর বাড়ি থেকে বার হয়ে দিগম্বরের বাড়ির দিকে ছুটি। দেখি সে বাইরে বার হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কদিন আগে তার বাবা একটা নতুন এ্যামব্যাসাডার গাড়ি কিনে তাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। গাড়িখানা বাইরে পার্ক করা রয়েছে। ফিকে সবুজ রঙের গাড়ি।
আমি হাসতে হাসতে গিয়ে বলি—চল তোর নতুন গাড়ি চেপে ঘুরব একটু।
—হঠাৎ।
—একটু আনন্দ করব। আজ আমার আনন্দের দিন।
দিগম্বর আমার দিকে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। আমার কথাগুলো সে যেন শুনতে পাচ্ছে না। অদ্ভুত একটা বিহ্বলতা তার চাহনির মধ্যে।
—কিরে অমন করে কি দেখছিস আমাকে? আমার আনন্দে তোর আনন্দ হয় না?
—হয়। মানে, এতদিন হতো। কিন্তু আজ যে জন্যে তোর আনন্দ আমি তাতে আনন্দ করতে পারি না। অথচ তোকে অতটা স্বার্থপর, অতোটা হীন বলে ভাবতে পারি না। তোর মতিভ্রম ঘটেছে।
—তুই কি বলছিস আবোল-তাবোল? তোর মাথা ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ। আমরা চিরকালের ব্যবসাদার। আমাদের মাথা ঠিক রাখতে হয়। শুধু ঠিক রাখলেই চলে না। ঠাণ্ডাও রাখতে হয়।

দিগম্বরের অদ্ভুত ব্যবহারে আমি প্রচণ্ড ধাক্কা খাই। ছেলেবেলা থেকে যাকে আমি ভালভাবে জানি, সে আজ যেন ভিন্ন মানুষ। তবে কি এখানেও সুচরিতার মতো কেউ এসে জুটেছে। কেউ এসে কি আমার একমাত্র বন্ধুর মন ভাঙিয়ে দিয়েছে।

—কিন্তু একবার শিক্ষা পেয়েছি। এবারে অভিমান আত্মসম্মান ইত্যাদি জিনিষগুলোকে প্রশ্রয় দেব না কখনো। তা হলে দিগম্বরও আলতার মতো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে।

—তোকে কেউ কিছু বলেছে নাকিরে দিগম্বর ?

—কি বলবে ?

—আমার নামে কিছু ?

—না।

—তবে অমন ব্যবহার করছিস কেন আমার সঙ্গে ? আমি কোথাও না গিয়ে তোর কাছে ছুটে এলাম আমার আনন্দের অংশীদার করার জন্যে। অথচ তুই—

—তোর আনন্দের অংশীদার আমাকে হতে বলিস ?

—হ্যাঁ। একবার নয়। একশোবার। তাছাড়া তোর নতুন গাড়িটাও ধার চাইব সেই দিনটির জন্যে।

—নতুন গাড়ি ধার চাইবি ?

—বাঃ, চাইব না ?

—কোন্ দিনটির জন্যে ?

—আসছে মাসের বারো তারিখ।

—সে দিনটি কিসের ?

—আমার সব চাইতে আনন্দের দিন। আলতার প্লেন সে দিন ল্যাণ্ড করছে।

দিগম্বরের মুখের কুঞ্চিত রেখাগুলো সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। সেখানে

অস্পষ্ট হাসিও ফুটে ওঠে। সে আমার পিঠে হাত রেখে বলে—ও, তাই বল। এতক্ষণ বলিস নি কেন? চল চল গাড়িতে উঠে সব শুনব। শিগ্‌গির চল। ছি ছি তুই এমন ভাবে কথা বলিস যে সব গুলিয়ে যায়।

এবারে আমার অভিমান চাড়া দিয়ে ওঠে। বলি—নাঃ, আমি একাই যাই। তোর তাড়া আছে আবার।

আমি দুপা এগিয়ে যেতেই দিগম্বর আমার হাত চেপে ধরে বলে—ইয়ার্কি হচ্ছে।

—না। আমি ইয়ার্কি করব কোন্ মুখে। আমি তো স্বার্থপর—হীন। না ভাই, ছেড়ে দে আমাকে।

এবারে দিগম্বর গম্ভীর হয়। বলে—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তোকে?

—কি কথা।

—আজ যদি সুচরিতা মরে তোর আনন্দ হবে?

—সুচরিতা মরলে আমার আনন্দ হবে? কেন? তার মরার সঙ্গে আমার আনন্দের সম্পর্ক কি?

—অথচ আমি তাই ভেবেছিলাম। সেইজন্যে রাগ হয়েছিল তোর ওপর। তবু বিশ্বাস করতে পারি নি।

—কিন্তু সুচরিতা মরতে যাবে কোন্ দুঃখে?

—দুঃখের কথা কি সব সময় মানুষের মুখে লেখা থাকে? মনে মনে পুষে রাখে। আচ্ছা সুচরিতা মরলে তোর দুঃখ হবে না?

—নিশ্চয়ই হবে। শত হলেও সে আমার পরিচিত। তুই সুচরিতা আর তার দিদির সম্বন্ধে যে ভাবে কথা বলিস আমার শুনতে ভালো লাগে না।

দিগম্বর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে—অথচ দেখ্ আধ-ঘণ্টা আগে আমি ওদের জন্যে কাঁদছিলাম।

—তার মানে?

—সুচরিতা মরেছে।

আলতার কথা আমি একেবারে ভুলে যাই। মনের মধ্যে আনন্দ থাকে না। বলি —সত্যি বলছিস ? সত্যি কথা ?

—হ্যাঁ রে।

—কি হয়েছিল ?

—কিছুই হয় নি। আমার পিসতুতো ভাই ওদের বাড়ির কাছেই থাকে। সে ফোন করল কিছুক্ষণ আগে। তাই বার হচ্ছিলাম। তখন তুই এলি। বললি, তোর আনন্দের দিন আজ। আমার ঠাণ্ডা মাথাও গুলিয়ে গেল। ভাবলাম, সুচরিতা মরেছে বলে তোর আনন্দ হয়েছে।

—অমন ভুল হয়। চল্ সুচরিতার বাড়ি। কিন্তু কিভাবে মারা গেল বললি না ?

—আত্মহত্যা।

আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। সুচরিতা শেষে আত্মহত্যা করল ? কেন ? সেই সিনেমা হলের মালিক মিন্টুর জন্যে ?

দিগম্বর গাড়ি চালাতে চালাতে বলে —সে একা যায় নি। সুস্মিতাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে।

আমার আর বোধশক্তি থাকে না। দিগম্বরের পাশে বসে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। চোখ বেয়ে তার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। রুমাল দিয়ে সেই অশ্রু মুছে ফেলছে।

সে বলে —কেন সুস্মিতাকে ওভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাই ভাবি। আমি দেখেছি ওদের ওপর তোর সহানুভূতি রয়েছে। আমি দেখেছি ওদের তুই সম্মান দিতে জানতিস। সত্যিই ওরা শুধু একটু আশ্রয় চেয়েছিল পৃথিবীতে। আর কিছু নয়। তারই জন্যে ওদের অতো ব্যস্ততা অতো অভিনয়। তুই আমার চেয়ে অনেক বেশী পরিণত দীপু।

আমরা ওদের বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ি। সামনে কিছুটা ভীড়। পুলিশও আছে।

ভেতর থেকে একজন ভদ্রমহিলার ভাঙা ভাঙা গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। ঠিক কান্না নয়। ইংরেজী আর বাংলা মেশানো অসংলগ্ন

কথা।

পুলিশ ডেড্ বডি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছিল। আমরা সুযোগ বুঝে ভেতরে ঢুকে পড়ি। আত্মীয় ভেবে কেউ আমাদের বাধা দিল না বোধ হয়।

দুজনা শুয়ে রয়েছে পাশাপাশি। স্থির। চোখের পাতা নির্মীলিত। সুচরিতার হাত দুখানা বুকের ওপর ওঠানো। সুস্মিতার দুই হাত দুই দিকে ছড়ানো। বড়ই রোগা হয়ে গিয়েছে সুচরিতা। দিগম্বর ঠিকই দেখেছিল।

পাশের ঘরে সেই ভদ্র মহিলার গলা শুনতে পেলাম। বলছেন,—লেট মি গো। আমি ধাক্কা দিলেই ওরা জেগে উঠবে। তোমরা জান না। দে আর প্লেইং ফুল উইথ মি।

ওঁকে বোধহয় আটকে রাখা হয়েছে। পুরুষ কণ্ঠে কে যেন বলেন—পাগলামী করো না। ওরা সকলে চলে গিয়েছে। চিরকালের জন্যে চলে গিয়েছে।

—ইম্‌পসিবল্। ওদের আমি চিনি। কত কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়েছি। ওদের বিয়ে হবে না? ছেড়ে দাও—

দিগম্বর নিম্নস্বরে বলে—ওদের মা। সবাই বলে, ঠিকমত শিক্ষা দিলে মেয়েদুটো ভালো হতো। ছেলেবেলায় ওদের স্বভাব খুব মিষ্টি ছিল।

—আলতাও তাই বলে।

হঠাৎ দিগম্বর ঘুরে গিয়ে সুস্মিতার মাথায় হাত রেখে সেই হাত নিজের কপালে ঠেকায়। কাছে এসে বলে—আজ সুস্মিতা বেঁচে উঠলে ওর বিয়ের খরচ আমি দিতাম।

ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছে দিগম্বর।

একজন পুলিশ অফিসার কাছে এসে বলেন—মর্গ থেকে বডি দুটো কারা নেবেন? আপনারা?

—কেন? এঁদের বাবা?

—তিনি দেখছি স্ত্রীকে সামলাতেই ব্যস্ত। ভদ্রলোককেও সুস্থ বলে

মনে হলো না।

—কিন্তু আমরা তো আত্মীয় নই।

—তবে?

—পাড়ার কাউকে পেলেন না? আমার পাড়ার নই। তবে মোটামুটি পরিচিত।

—এসব ব্যাপারে কেউ এগিয়ে আসে না মশায়। পাড়া-প্রতিবেশীরা যদি কুৎসা রটায় আর কারও ভালো দেখলে জ্বলে পুড়ে মরে। কতো দেখলাম।

আমি বলে উঠি—আমাদের হাতে আপনারা দিতে রাজী হলে, আমরা নিতে পারি।

দিগম্বর বলে—তুই যাবি দীপু?

—কেন যাব না? তুই-ও চল্। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

—মন্দ বলিস নি। জীবিত থাকতে অপমান করেছি। মৃত্যুর পরে সম্মান দেখানো যেতে পারে।

পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করি—কখন বডি পাবো?

—বিকেলের দিকে।

ওঁরা আমাদের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি নিয়ে নেন। সুচরিতার বাবার আপত্তি হয় না।

আমরা বার হয়ে আসি। তখনো সেই অদেখা ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ওদের আমি বিয়ে দেব। তোমরা ষড়যন্ত্র করেছ। আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে চাইছ।

শত হলেও মা।

আমাকে গড়িয়াহাট রোডের মোড়ে নামিয়ে দিয়ে দিগম্বর সৎকার সমিতির, গাড়ি ঠিক করতে চলে যায়।

মনটা কেমন হয়ে যায়। সুচরিতার কথার ভঙ্গি, আমাকে জড়িয়ে ধরার প্রচেষ্টা, একে একে ছবির মতো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ওর সব কিছুর মধ্যে একটা বড় সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠত। সেই সত্য

হলো, সে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। অনেক জায়গায় ঠোক্কর খেয়েও সে নিরাশ হয় নি প্রথমটা। কত জায়গায় প্রবঞ্চিত হয়েছে। বড় মারাত্মক সেই প্রবঞ্চনা। সে-ও প্রতারিত করত সবাইকে—আমাকেও করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হেরে গেল। শেষে এমন কিছু ঘটেছে, যার ফলে দুই বোনই বুঝে ফেলেছিল জীবনে আর তাদের সাধ পূর্ণ হবে না।

সুচরিতার আত্মার জন্যে মনে মনে প্রার্থনা করি।

বিকেলে সৎকার সমিতির গাড়ি নিয়ে মর্গের সামনে উপস্থিত হলে, সেই পুলিশ অফিসারটি কাছে এসে হেসে বলেন—ওরা কেউ কিছু লিখে গেল না কেন বলুন তো? মৃত্যুর জন্যে কাউকে তো দায়ী করা উচিত।

দিগম্বর বলে—প্রয়োজন বোধ করে নি বোধহয়।

পুলিশ অফিসার বলেন—আপনারা দুজনই কি দুই বাবা?

দিগম্বর চেঁচিয়ে ওঠে—কি বললেন?

—বলছি, ওদের পেটের বাচ্চা দুটোর বাবা কি আপনারাই?

আমরা একটা কথাও বলতে পারি না। অনেক পরে দিগম্বর বলে—আমরা যদি বাবা হতাম, ওদের তাহলে মরতে হতো না। তাছাড় এখানে আসতামও না।

—জানি জানি। আপনারা যেভাবে এগিয়ে এসেছেন, দেখেই বুঝতে পেরেছি। বাবা হলে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতেন। তবু একবার কথাট বলে, আপনাদের যাচাই করে নিলাম। যাচাই করতে করতেই জীব গেল।

—হ্যাঁ। বড় মারাত্মক যাচাই। এভাবে অস্থানে যাচাই-এর অভ্যা আছে নাকি?

অফিসার হাসতে থাকেন।

বারো তারিখের দিন দশেক আগে আলতার একটি ছোট চিঠি পাই। অদ্ভুত চিঠি। কোনো সম্বোধন নেই। শুধু দুটি ইন্‌ভারটেড্ কমা।
সে লিখেছে :
" "

আমি যাচ্ছি। প্রথমে দিল্লী। তারপর প্রথম ফ্লাইটেই কলকাতা। সেই রকম ব্যবস্থা করতে বলেছি। দিল্লী পৌঁছোবো সকাল ছটায়। শুনেছি তার ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কলকাতায় রওনা হতে পারব। এতে আমার শেষ কপর্দকও চলে যাবে। কিন্তু এ-ছাড়া আর কিছু করার উপায় নেই। কদিন থেকে আমার মনের মধ্যে ভয় ঢুকেছে, যদি দেরী হলে আর পৌঁছোতে না পারি। কেন এই ভয় বুঝি না। অনেক যুক্তি তর্ক দিয়ে মনকে শান্ত করতে চেয়েছি। পারি নি। কত সব কাহিনী মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দেয়। বেশীর ভাগ কাহিনী বই-এ পড়া। তবু সে-গুলোকে সত্য বলে মনে হয়। এটাই যেন স্বাভাবিক। কত বই-এ পড়েছি এমনি ভাবে বহু প্রত্যাশিত একটি মুহূর্ত নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। আমার বেলাতেও কি তেমন হবে? আমি শেষ পর্যন্ত তোমার কাছে পৌঁছোতে পারবো?
তবু তুমি দমদমে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।

প্রণতা
তোমার আলতা

এ কেমন ধরনের চিঠি? আলতার বুকের কাঁপুনি আমার বুকেও সং-ক্রামিত হয়। কাকে দেখাবো এ চিঠি? মাকে না দিগম্বরকে? দিগম্বরকে দেখালে সে হেসে উড়িয়ে দেবে। বলবে, মেয়েদের মনের এও এক ধরনের অভিব্যক্তি। ওর এই মন্তব্যে আমার ছট্‌ফটানি কমবে না।
মাকেও দেখাবো না। সব ব্যাপারেই মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো মায়ের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। এই বয়সে বরং তাঁরই আমার ওপর নির্ভর করা স্বাভাবিক। কথায় কথায় আমি যদি ক্রমাগত আমার দুর্বল মনের পরিচয় দিতে থাকি, তা হলে তাঁর নির্ভরতা কমে যাবে। তিনিও শান্তি

পাবেন না। দুঃখ আর আঘাত আমাকেই একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সইতে হবে।

চিঠিখানা ভাঁজ করে আলতার অন্য চিঠিগুলোর সঙ্গে রেখে দিই। আর তো মাত্র দশ দিন। সে আসছে আগামী সোমবারের পরের সোমবারে। আগামী মঙ্গলবারের পরের মঙ্গলবারে আমি এইসময় কোথায় থাকব—কি করব?

কথাটা ভাবতে কেমন লাগে যেন। সেই দিনটিতে আলতা এই কলকাতা শহরে আছে কিংবা নেই। সেই সময় আমি অত্যন্ত শিক্ষা আর ভরা মন নিয়ে আমার সব কাজকর্ম করছি কিংবা—কিংবা? না। এ সব ফালতু কথা ভেবে লাভ নেই। পুরুষের পক্ষে এই ধরনের চিন্তা মারাত্মক। আমার আলমারিতে অনেক দিনের অব্যবহার্য একটি স্কিপিং ছিল। মন থেকে সব চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করার জন্যে সেই স্কিপিং নিয়ে লাফাতে থাকি ঘরের মধ্যে।

স্কিপিং করতে করতে গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকে। বুঝতে পারি পরের দিনে দুই উরুতে প্রচণ্ড ব্যথা হবে। এক সঙ্গে এত প্রবল বেগে লাফানোর ফলভোগ করতেই হবে।

তবু সুফল পেলাম। মাথাটা সক্রিয় হলো। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেললাম অলকেশবাবুর কাছে একবার যাওয়া প্রয়োজন।

ভদ্রলোককে গিয়ে আলতার শেষ চিঠির কথা বলে জানতে চাইলাম ফিরে এসে সে কোথায় উঠবে?

—কেন আমার এখানে? অসুবিধে কিসের?

একটু ইতস্তত করে আমি বলি—হয়তো এখানে সে আসতে চাইবে না।

—কেন? এই ফ্ল্যাট জনক রোডের চেয়েও ভালো।

শেষে বলেই ফেলি—মিসেস ত্রিবেদী থাকতেন কিনা।

ভদ্রলোক খুবই অপ্রস্তুত হলো। বলেন—তা ঠিক। তুমি ঠিক বলো তা হলে কোথায় ওঠাবে? তোমার বাড়িতে? সেটা কি খুব ভা

দেখায় ?

—না। সেটা খুবই খারাপ হবে। আমার মনে হয় জনক রোডে ওঠাই ভালো। আপনি তো ভাড়া টেনে আসছেন।

—হ্যাঁ। বেশ, তবে ওখানেই উঠুক। ওর জন্যেই রেখেছি ওটা।

—কিন্তু একা যে থাকতে পারবে না। আপনি চলে আসার পর থেকে ওর খুব ভয় করতো। কোনোদিনও রাতে ঘুমোতে পারে নি।

ভদ্রলোক ঝিম্ ধরে থাকেন। বুঝতে পারি অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে দাহ্য পদার্থ বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই ওঁর ভেতরে।

—আপনিও চলুন না এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে।

—আমি কোন্ মুখে যাব ? তুমি জান না, ওখানে আমার কি রকম সুনাম ছিল। আমাদের পরিবারকে আদর্শ পরিবার বলতো সবাই। সেখানে গিয়ে আমার পক্ষে থাকা কি সম্ভব ?

—কিছুদিন অন্তত গিয়ে থাকুন। তারপরে বাড়িটা ছেড়ে দেবেন। লোকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে উপায় কি ? আপনার যখন সুনাম ছিল, কেউ কি তখন কোনো উপকারে এসেছে ? শুনেছি, আপনার স্ত্রীর মৃত্যু হলে শ্মশানে যাওয়ার জন্যে পাড়ার লোকদের ডেকে ডেকেও আনতে পারেন নি। তাছাড়া ওদের দেখতে দিন আপনি আপনার পুরোনো জীবনে ফিরে এসেছেন। দেখুক ওরা, আপনার মেয়ে আগের মতোই আবার হেসে খেলে বেড়াচ্ছে।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ভাবেন। তারপর বলেন—তোমার কথা যুক্তিপূর্ণ। বেশ আমি ওখানেই যাবো। নিজের জন্যে মেয়ের স্বার্থ বিসর্জন দেব না আর। কবে যাব বলতো ?

—যেদিন খুশী।

—নীলার আসতে তো এখনো দশদিন বাকী আছে। এতো তাড়াতাড়ি যেতে পারবো না।

—কয়েকদিন আগে যাওয়াই তো ভালো।

—দিন তিনেক আগে যাবো। আমাদের সেই পুরোনো কাজের মেয়ে-

টিকে খবর দিতে হবে। লেকের ওপারে থাকে। আজই যাবো তার ওখানে।

অলকেশবাবুর চোখে আলো ফুটতে দেখেছিলাম, এখন সক্রিয়তা দেখতে পেলাম। তিনি প্রায় স্বাভাবিক।

বাড়ি থেকে বার হয়ে কারখানার দিকে যাচ্ছিলাম। তাড়া ছিল খুব। পেছন থেকে ডাক শুনলাম—এই, এই দীপু—

ফিরে দেখি সেনগুপ্তের রক থেকে মানু চেঁচাচ্ছে।

তার কাছে গিয়ে তপ্ত কণ্ঠে বলি-- সাত সকালে এমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিস কেন?

—অমনি ষাঁড় হয়ে গেলাম? জলজ্যান্ত মানুষটা বসে আছি রকের ওপর, ফিরেও চাইলি না?

—তুই একা আছিস বলে চোখে পড়ে নি। সুখেনরা কোথায়?

—আসবে এখনি। না এসে যাবে কোথায়? কারখানায় চললি তো?

—আবার কোথায় যাবো।

—অরিন্দমটাকে তুই ডোবালি।

—কেন? ওকে ডোবাতে যাবো কেন?

—খুব কম আসে। তোর কারখানার বাড়বাড়ন্ত হোক, কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি। সুখেনদের আর টানিস না ভাই। রক কানা হয়ে যাবে।

আমি হাসি। তারপর পা বাড়াতে চাই।

—দাঁড়া। কারখানায় যেতে একটু দেরি হলে ক্ষতি হবে না। বলছিলাম, তোর বিয়ে নাকি রে?

হতবাক হয়ে বলি—আমার? কোথায় শুনলি?

—শুনবো আবার কোথায়? দেখছি, তাই বলছি।

—দেখছিস? অবাক করলি। যার বিয়ে সে জানে না, আর তুই জেনে

ফেললি ? আবার দেখেও ফেললি ? কি দেখেছিস ?

—হুঁ হুঁ, চোখ থাকলেই দেখা যায়। সেদিন তোদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম মাসীমা খুব ঘষা মাজা করছেন। জিজ্ঞাসা করায় বললেন, অপরিষ্কার হয়েছিল। ঘরগুলো একবার হোয়াইট-ওয়াস করবেন।

—হোয়াইট-ওয়াস করলে বিয়ে করতে হয় নাকি? কারখানার দৌলতে সংসার চলে যাচ্ছে ভালোভাবে, তাই মায়ের একটু ইচ্ছে হয়েছে। বাবা বেঁচে থাকতে দু বছর পরপর হোয়াইট ওয়াস হতো। তোর মনে নেই ?

—খুব আছে। কিন্তু আরও কিছু দেখেছি।

—কি দেখেছিস।

—মাসীমার মুখের মধ্যে একটা কী-যেন হাব-ভাব। তোর মধ্যেও একটা কেমন ধরনের চঞ্চল আনন্দ।

মানুকে মনে মনে তারিফ না করে পারি না। বলি—ঠিক আছে, বিয়ে হলে, নেমন্তন্ন তো পাবিই।

—ঠিক আছে। আর একটা কথা।

—বল্।

—কাল রাতে খুব কষ্ট পেয়েছিলি ?

—কেন ?

—ফ্যান লাইট বন্ধ ছিল যে।

—হ্যাঁ। সবাই পেয়েছে কষ্ট। আমি একা নই। এতো নতুন কিছু নয়।

—কারখানার ক্ষতি হয় নি লোড-শেডিং-এর জন্যে ?

—হচ্ছে বৈকি ? হামেশাই হচ্ছে ? কিন্তু এ কথা বলছিস কেন ?

মানু প্রথমে একটু ইতস্তত করে তারপর বলে—ভাবছি হকার দেবীর মতো বিদ্যুৎ-দেবীর একটা পুজো ঠুকে দিলে কেমন হয় ?

আমি দু পা এগিয়ে গিয়ে ওর চুল মুঠো করে চেপে ধরি।

—এই ছাড়্ ছাড়্। লাগে। আগে কথাটা শোনাই।

ছেড়ে দিয়ে বলি—বিদ্যুৎ দেবী করতে গেলে হকার দেবীও ডুববে।

—কিন্তু বিদ্যুৎ যে দেবী, এ কথা মানিস তো? স্বর্গের লক্ষ্মীকে যেমন লোকে সিন্দুকে আর ব্যাংকে এনে ভরে ফেলে তেমনি আকাশের বিদ্যুৎ-কেও আমরা সাঁওতালদি, ব্যাণ্ডেল আর মুলাজোড়ে ভরে ফেলে একটু একটু করে ছাড়ি। অস্বীকার করতে পারিস?

—আমার স্বীকার অস্বীকারের দরকার নেই। তবে এর মধ্যে আমি নেই। এক পয়সাও চাঁদা দেব না।

—আমি যে অলরেডি স্বপন দেখে ফেলেছি। বিরাট বজ্রপাত হলো একটা তালগাছে। তারপর তালগাছের মাথার ওপর থেকে জ্যোতির্ময়ী কন্যা—সেই একটা কবিতায় পড়েছিলাম, মনে নেই?

—খুব মনে আছে। কিন্তু এ সব ছাড়্।

—আর যে কিছুই করার নেই রে। তুই বলবি ব্যবসা করতে। সবাই কি ব্যবসা করতে পারে? নন্দর দোকানের পাশে একটা তেলেভাজার দোকান খুললে বেশ চলে জানি। কিন্তু আমি পারবো না। বন্ধুরা প্রথম দিনেই খেয়ে খেয়ে একেবারে লাটে তুলে দেবে। বাধা দিতে পারবো না। তেলেভাজা মচমচ করে কামড়ে ওরা যখন চোখ বুজবে আরামে, তখন যে আমার বড় আনন্দ হবে।

—ওই যে সুখেন আসছে।

সুখেন এসে পৌঁছালে মানু বলে—কাল আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি রে। কিন্তু দীপু জোর করে বলছে, আমি কিছুতেই দেখি নি।

—কি দেখেছিস?

—মানু চিন্তিতভাবে জ্যোতির্ময়ী কন্যার কথা বলে।

সুখেন ঠোঁট উল্টে বলে—চলবে না। ধোপে টিঁকবে না।

—ধুর শালা। তা হলে চায়ের অর্ডার দে নন্দর দোকানে।

দমদমে এসে বসে আছি দেড় ঘণ্টা আগে থেকে। দিল্লীর ফ্লাইট বেলা সাড়ে এগারোটায়। কারখানায় যাওয়া হয় নি। বলে এসেছি বিশেষ

কাজ আছে। সময় পেলে বিকেলের দিকে যাবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারবো কিনা বিশেষ সন্দেহ রয়েছে। আলতা আসছে আজ। যাওয়া কি সম্ভব ? কিন্তু যদি না আসে ?

অরিন্দমকে বলেছি, সব সময় কারখানাতেই থাকতে। দিগম্বরকে বলেছি সময় করে একবার গিয়ে অরিন্দমকে সঙ্গ দিতে। সে কথা দিয়েছে। তার নতুন এ্যামব্যাসাডার আজ আমার জিম্বায়। ড্রাই-ভারকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে সারাদিন যেন আমার সঙ্গে থাকে। এতে, নিজের ট্যাক্সি খরচা হবে। কিন্তু হাসতে হাসতে বলেছে, গুণে গুণে একশোটি টাকা ট্যাক্সি খরচা হলেও সে সানন্দে দেবে।

গাড়ি নিয়ে দমদমে এসে বসে আছি। কিন্তু এখনো এক ঘণ্টা বাকী। অলকেশবাবু তিনদিন আগে জনক রোডের বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন। আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বলেছেন, চোরের মতো অফিসে যাতায়াত করছেন রোজ। পাড়ার কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলে না। বিশেষ আসে যায় না তাতে। দোকানদাররা খুব ভালো ব্যবহার করে। কারণ খদ্দের হিসাবে তিনি দরাজ। অনেকে তো তিনি ছিলেন না বলে দুঃখ প্রকাশই করে ফেলল। কিন্তু অতি পরিচিত ছিল যারা, তারা এখন অপরিচয়ের ভান করে আশেপাশের সব বাড়ি থেকে তাঁকে দেখে উঁকিঝুঁকি মারে, এটা তিনি বুঝতে পারেন। আলতা সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলেন নি তিনি। বলবেনই বা কাকে ?

অলকেশবাবু আমার সঙ্গে দমদমে আসতে চেয়েছিলেন। আমি মানা করেছি। বলেছি, আলতা বাড়িতে পৌঁছে তাঁকে দেখে বেশ চমকে যাবে। সেটা একটা ভালো সারপ্রাইজ হবে। কি বুঝলেন জানি না। আমার দিকে মৃদু হেসে রাজী হয়ে গেলেন।

মানুষের জীবনের এই বিশেষ লগ্নে এইভাবে প্রতীক্ষা করার অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়তো হয়েছে অথবা হবে। কিন্তু আমার মনে হতে থাকে পৃথিবীতে আমিই একমাত্র যুবক যে আজ এর সম্মুখীন হয়েছে। ইতিমধ্যে দু'একবার উঠে গিয়ে খবর নিলাম, সময়ের কোনো পরিবর্তন

হয়েছে কিনা। তারা বললো, এখনো সে রকম কোনো খবর নেই।
একজন ভদ্রমহিলার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো ইতিমধ্যে। তাঁর হাবভাব চালচলনের জন্যেই তাঁকে না দেখে পারলাম না। কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। চেহারা এককালে বেশ সুশ্রী ছিল বলেই মনে হয়। পরিচ্ছদ খুব পরিষ্কার না হলেও পরিপাটি। অনেকটা এয়ার-হোস্টেসদের ধরনে কাপড় পরা। ভ্রূ আঁকা, ঠোঁটে লিপস্টিকের পরশ। অথচ বয়স হয়েছে।

অনুমানে বুঝলাম, তাঁরও কোনো প্রিয়জন আসছে আজকের ফ্লাইটে। তাই একটু বেশী মাত্রায় ব্যাকুল হয়েছেন। সবার মানসিক স্থৈর্য আর সংযম সমান নয়। এ কথা আমি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। তাই উপস্থিত সবাই ভদ্রমহিলার আচরণে বিরক্ত হলেও, আমার সবটুকু সহানুভূতি তিনি পেলেন। হয়তো তিনি একটু অশোভন ভাবে ছটফট করছেন, মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে আপন মনে বকেও চলে-ছেন। তাই বলে অমন ভাবে মুখের ওপর স্পষ্ট বিরক্তি ফুটিয়ে তোলা উচিত নয়। দু'একজন কড়া ভাষায় কিছু বলেও দিল তাঁকে।

হাতঘড়িতে দেখি এগারোটা বাজল। আমার বহু দিনের প্রতীক্ষার সেই বিশেষ সময়টি যত এগিয়ে আসে ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা তত বাড়তে থাকে। মনে মনে ভাবি, শেষে আমিও ওই ভদ্রমহিলার মতো ছটফট শুরু না করি।

ঠিক সেই সময়ে দেখি ভদ্রমহিলা ঠিক আমারই পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং আমার দিকে চেয়ে মিটমিট হাসছেন। তারপর সুন্দর ভঙ্গিমায় সামনের দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করেন—এয়ার ইণ্ডিয়া?

প্রথমে থতমত খাই। ভাবলাম উনি হয়তো জানতে চাইছেন এয়ার ইণ্ডিয়ার ফ্লাইটের জন্যে অপেক্ষা করছি নাকি।

বলি—হ্যাঁ।

—আমার প্লেন। আমিও যাবো। এই প্রথম? ভয় নেই। আমি থাকলে ইউ উইল ফিল হোমলি।

আমতা আমতা করে বলি—আমি তো যাচ্ছি না। একজন আসছেন। তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।

ভদ্রমহিলার উৎসাহ মিলিয়ে যায়। তিনি আবার বিড়বিড় করে কি যেন বলতে থাকেন। তিনি তাঁর কথা বলার স্টাইল, সুন্দর ইংরেজী উচ্চারণ আর পরিশীলিত আচরণে আমাকে চমকে দিয়েছিলেন। অথচ এখন একেবারে অন্যরকম। মনে হয় তিনি মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন। চেয়ে চেয়ে দেখি তাঁকে। সম্পূর্ণ উদাস এখন। পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গে যেন সম্পর্ক নেই।

আর পঁচিশ মিনিট বাকী। এই সময়টুকুতে টগবগ করে উত্তেজনায় ফোটার চেয়ে অন্যভাবে সময় কাটালে মন্দ হয় না।

ভদ্রমহিলাকে ডাকি, তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ান।

আমি বলি—বসুন না এখানে।

—নো। আম্ সরি: সময় হয়ে যাবে।

—আপনি বাইরে যাচ্ছেন?

বেশ একটু আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে তিনি বলেন—তা বলতে পারেন। তবে কালই ফিরব আবার। এখন আমি ফার ইষ্ট কভার করছি। আপ টু জ্যাপানি।

মাথামুণ্ডু কিছুই, বুঝি না আমি। ভদ্রমহিলা কোনো আন্তর্জাতিক কম্পানীর জোনাল ম্যানেজার নাকি? কিংবা ভ্রাম্যমান দূত। শেষে ভেবে নিলাম, উনি পাগল!

ঘাড় ঝাঁকিয়ে ওঁর কথা মেনে নিই।

উনি প্রশ্ন করেন—হংকং গিয়েছেন কখনো?

—আজ্ঞে না।

—ন্যু অর্ক?

—না। কল্পনাও করি না।

—য়্যু হ্যাভ মিশড এ লট্।

—একশোবার। সবাই কি আপনার মতো সঙ্গতি সম্পন্ন হয়? আপনিই বলুন।

ভদ্রমহিলা খুব সুন্দরভাবে চাপা হাসি হেসে বলেন—কি বললেন? সঙ্গতি সম্পন্ন? চমৎকার বাঙলা তো? কিন্তু আমার সঙ্গতি কোথায়?

—তবে যে বললেন, ওই সব জায়গায় গিয়েছেন?

—গিয়েছি বৈকি? তার জন্যে সঙ্গতির প্রয়োজন হয় নাকি?

—টাকা লাগে না?

—আমি গিয়েছি চাকরির খাতিরে।

—চাকরী? দারুণ চাকরী তো?

—দারুণ? বেশ বলেছেন কথাটা। আমিও এককালে তাই ভাবতাম। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। কাউকে যদি আমার ভালো লাগে,সে অনারেবল প্যাসেঞ্জার বলে কি মন দেওয়া-নেওয়া করতে পারবো না?

আমি হতাশ হই। এঁর সঙ্গে কথা চালিয়ে যাওয়া বৃথা। শেষে কি বলতে কি বলে ফেলবেন। হাত ঘড়ি দেখি। আরও পনেরো মিনিট। আলতার প্লেন এখন কোথায়? কোন্ জেলার ওপর? পশ্চিম বঙ্গের কোনো জেলা?

ঠিক সেই সময় এ্যানাউন্স করা হলো, প্লেন পনেরো মিনিট দেরিতে পৌঁছোবে। মনের ভেতরে মৃদু ধাক্কা খেলাম। আরও আধঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে।

ভদ্রমহিলা বলেন—বলুন, মানুষের মন দেওয়া-নেওয়ায় কি কোনো বাছবিচার আছে? ওদের একজন ছিল বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়।

কথা ঘুরিয়ে আমি বলি—যাই বলুন। আপনার চাকরির তুলনা হয় না। প্লেনে করে দেশ ভ্রমণ।

—দেশ ভ্রমণ? তা বলতে পারেন। দেশের ওপর দিয়ে যাওয়া তো বটেই। যে দেশে পৌঁছোলাম, সেখানে গিয়ে সোজা হোটেলে। পরের দিনের ফ্লাইটে আবার ব্যাক্ টু দমদম। এরই নাম হলো এয়ার হোস্টেস।

—আপনি এয়ার হোস্টেস ?

তবে কি ভেবেছিলেন ? প্যান অ্যামেরিকানের রিজিওন্যাল ম্যানেজার ?

অদ্ভুত পাগল তো ? আমার হাসি পায় না। কৌতুক অনুভব করি।

ভদ্রমহিলা বলেন—আমি বুঝেছি।

—কি বুঝলেন ?

—আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। বেশ, চলুন ওই এয়ার ইণ্ডিয়া অফিসে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যাই। আলতার প্লেন সম্বন্ধে আর কোনো খবর আছে কিনা জেনে নিতে পারবো।

ভদ্রমহিলা অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে একজন মধ্যবয়স্ক অফিসারকে বলে—বলুন তো মিঃ চাকলাদার আমি এয়ার হোস্টেস কিনা ? ইনি বিশ্বাস করতে চাইছেন না।

মিঃ চাকলাদার, ভ্রূ কুঁচকে বলে ওঠেন—আঃ মিস ডাট্ আর কত জ্বালাবেন ? এবারে বাড়ি যান।

—বাড়ি ? বাড়িতে কে আছে ? গিয়ে লাভ ?

—তবু যেতে হয়। মিঃ সান্যাল তো আছেন। তাঁর কথা একটু ভাবতে হয়।

—থাকুক। ওরা আগে ফিরে আসুক, তারপরে যাবো। ওরা না এলে কি করে যাবো ? মিঃ সান্যাল তো ওদের কথাই জিজ্ঞাসা করবেন।

—না। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনি যান।

—না। আমি যাবো না। আপনারা সবাই মিলে চক্রান্ত করেছেন। সবাই—

ভদ্রমহিলা দ্রুত লাউঞ্জের দিকে চলে যান।

আমি মিঃ চাকলাদারকে প্রশ্ন করি—উনি পাগল ?

—হ্যাঁ। তবে সত্যিই এয়ার হোস্টেস ছিলেন এককালে। দু দুটো মেয়ে একসঙ্গে আত্মহত্যা করল কিনা।

—কে ? সুচরিতা ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। কাগজে তো পড়েছেন। তাদেরই মা। বড়ই দুঃখের। প্লেনের সময় জানার মতো অবস্থা থাকে না আমার। ফিরে গিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকি। এ কেমন ধরনের যোগাযোগ ? আজ আলতা ফিরে আসছে বিদেশ থেকে। আর আজই সুচরিতার মা সন্তান হারা হয়ে উন্মাদ অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন এখানে? এর তাৎপর্য কি? বিধাতা কি আমাকে কিছু বোঝাতে চাইছেন ?

দেখি মিস ডাট্ আমার দিকেই আবার এগিয়ে আসছেন। তাঁর মেয়ের নাম ছিল সুচরিতা সান্যাল। দিগম্বর ঠিকই বলেছিল। মিঃ সান্যালের সঙ্গে মিস ডাট্-এর বিয়ে হয় নি কখনো। কথাটা গোপন কিছু নয়। মিঃ চাকলাদার এমন স্পষ্ট ভাবে বলতেন না তা হলে।

মিস ডাট্ আমার কাছে এসে বলেন—তোমার বয়স কত কম। এতক্ষণ আপনি বলছিলাম কেন বলো তো ?

—কি জানি। না বললেই পারতেন। আমিও সেই কথা ভাবছিলাম।

—আজকালকার ছেলে তো ? যদি রাগ করতে ? তাই।

—না। রাগ করব কেন ? আপনি আমার মায়ের মতো।

—কি বললে ? আর একবার বল।

—আপনি আমার মায়ের মতো।

—ও। মায়ের মতো। মা নই ? আমাকে তুমি তোমার মা করলে ?

—করব। আমার কিন্তু আর একটা মা আছেন।

—তাতে কি হলো ? আমিও তোমার মা হবো।

—ভালই তো ? আমার দুজন মা হলে বেশ মজা হবে

—কিন্তু কেমন করে তোমার মা হব ?

—এই তো হয়ে গেলেন।

—না না। এভাবে নয়।

—তবে ?

—কি যেন—কি যেন—। যাঃ, ভুলে গেলাম।

আমি চুপ করে থাকি। এ কোন্ সমস্যায় পড়লাম আজকের এই বিশেষ মুহূর্তে!

ভদ্রমহিলা বলে ওঠেন—হ্যাঁ মনে পড়েছে। আমি কি করে তোমার মা হবো জানো? খুব সহজ। বলব?

—কি করে?

ভদ্রমহিলা দুহাত বাড়িয়ে আমার মাথাটা টেনে নিয়ে কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বলেন—কাউকে বলো না আমার মেয়ে খুব ভালো মেয়ে। তাকে তুমি বিয়ে কর। তাহলে মা হয়ে যাবো।

ঠিক তখনই ঘোষণা করা হলো আলতার ফ্লাইট দু মিনিটের মধ্যে ল্যাণ্ড করছে।

আমি ভদ্রমহিলার হাত থেকে মাথা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটতে থাকি। বাইরে ফাঁকা জায়গাটায় ভীড় জড়ো হয়েছে। কর্মীরা কর্ম চঞ্চল। যাত্রীদের আত্মীয় স্বজন একপাশে দাঁড়িয়েছে। আমিও সেখানে যাই।

একটি মেয়ে বলে ওঠে—ওই যে। দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটি হাততালি দিয়ে ওঠে। তার পাশে একজন বর্ষীয়ান মহিলার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে।

দূরে দিকচক্রবালে একটি বিন্দু। সেটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। তারপর আরও বড়।

মেয়েটি বলে—দাদাকে কিন্তু তিন দিন বাড়ির বাইরে বার হতে দেব না বলে রাখছি মা।

—আচ্ছা আচ্ছা। ওর বন্ধুদের তুই ঠেকিয়ে রাখিস। দেখব কেমন পারিস।

প্লেনটা নিচের দিকে নেমে আসে।

অধীর আগ্রহে আমরা অপেক্ষা করি। কারও বোধহয় নিশ্বাস পড়ে না।

হঠাৎ এ কি হলো?

প্লেনটা নিচে না নেমে আবার ওপর দিকে উঠে গেল কেন? সবাই

কথা বলে ওঠে একসঙ্গে। প্লেনটা যেন কোনোরকমে আশেপাশের সংঘর্ষ এড়িয়ে গেল। ধাক্কা লাগতে পারতো গাছে কিংবা অন্য কিছুতে। একজন ভদ্রলোক ছুটে যান খবর নিতে। এয়ার পোর্টের যে সব কর্মী অপেক্ষা করছিল তারাও উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে মনে হলো। একটা অস্বাভাবিককিছু ঘটেছে।

আমি আবার প্লেনটি দেখতে থাকি নির্নিমেষ নয়নে। আলতা রয়েছে ওতে। আলতা। সে এখন আর দূরের কেউ নয়। সে আমার খুব নিকটজন। তবে কেন প্লেনটি আবার ওপরে উঠে গেল? আবার কেন চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করল? ওরা কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছে? এ যে সর্বনেশে রসিকতা।

প্লেনটা ঘুরতে থাকে মাথার ওপর। এক-দুই-তিন। কারও দিকে চাইবার মতো মনের অবস্থা থাকে না আমার। চোখটা আটকে থাকে প্লেনের সঙ্গে।

—সর্বনাশ হয়েছে।

চমকে চেয়ে দেখি, যিনি খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসেছেন। কপালে হাত দিয়ে বসে পড়েছেন।

সেই মেয়েটি ডুকরে কেঁদে উঠে বলে—কি হয়েছে? কি হয়েছে বলুন? নামছে না কেন?

ভদ্রলোক বলেন—নামতে পারছে না। চাকা আটকে গিয়েছে। বার হচ্ছে না।

একটা আতঙ্কের ধ্বনি নির্গত হয় সবার মুখ দিয়ে। আমার মাথার ভেতরটা কেমন ক'রে ওঠে। প্লেন তখনো ঘুরছে। তার আওয়াজ এখন আর্তনাদের মতো শোনায়। অথচ একটু আগে শোনাছিল বাঁশীর মতো। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়—আলতা। তুমি এ কি করছ?

আগের ভদ্রলোক আবার ছুটে গেলেন কণ্ট্রোলে। দিশেহারা তিনি সচল রয়েছেন। আমি সম্পূর্ণ স্থবির।

মেয়েটি সমানে কেঁদে চলে। অনেকেই চোখ মুছতে থাকে।

প্লেনের আওয়াজের মধ্যে আমি যেন আলতার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। বলছে—আমি তো এসেছি। অনেক দূর থেকে এসেছি। তুমি আমাকে নামিয়ে নাও। আমি বড় ক্লান্ত। আর পারছি না।

ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কোথায় যাবো? আমার ডানা নেই। তবু হয়তো ছুটতাম। সেই সময় আগের ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলেন—কোনোও উপায় নেই। কেউ কিছু করতে পারবে না। এই ভাবেই ঘুরবে। যতক্ষণ পেট্রল রয়েছে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তারপর নামতেই হবে। চাকা ছাড়া নামবে। ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং।

ভদ্রলোক ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেন—হায় ভগবান। এ কি করলে? অনেক কষ্ট করে ছোট ভাইকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। ভাই মানুষ হয়ে ফিরেছে। কত আনন্দ করে সেই গল্প তিনি শোনাচ্ছিলেন। সবাই-কে কিছুক্ষণ আগে।

হঠাৎ আমার খেয়াল হলো একজনকে আমি প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছি একটু আগে। তিনি কতটা নির্ভর করেছিলেন আমার ওপর। আর আমি নিষ্ঠুরের মতো তাঁর নির্ভরতা দু পায়ে দলে চলে এসেছি। তাঁকে আনন্দ দিতে হবে।

আমি দৌড়োতে থাকি। সুচরিতার মাকে খুঁজে বার করতে হবে। ক্ষমা চাইতে হবে তাঁর কাছে।

এদিক ওদিক তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাই না তাঁকে। কোথায় গেলেন? বাইরে বার হয়ে যাই। কালো পিচ ঢালা রাস্তা। অনেক গাড়ি পার্ক করা আছে। একটা আইল্যাণ্ড। সেটিকে গোল করে ঘিরে রেখেছে রাস্তা। সেখানে দেখতে পেলাম তাঁকে। একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হাত নেড়ে কী যেন বলছেন।

কাছে গিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরে ডাকি—মা।

শিউরে ওঠেন তিনি—কে?

—আমি।

—ও। তুমি। চিনতে পেরেছি। আমাকে মা বললে কেন?

—আপনি যে মা হতে চান।
—কিন্তু আমরি মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে না। ভাবছি ভুলে গিয়েছি? অত সহজে ভুলি না। বিয়ের নামে ভয় পেয়ে তুমি পালিয়ে গেলে।
মনে মনে ভাবি, সুচরিতা বেঁচে থাকলেও এই মুহূর্তে তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারতাম। শুধু আলতা বাঁচুক।
—আমি বিয়ে করবো। আপনি আশীর্বাদ করুন।
ভদ্রমহিলার মুখে এক অপূর্ব আনন্দ ফুটে ওঠে। তিনি বলেন—বিয়ে করবে? সত্যি বলছ? বলো। আমি বিশ্বাস করব তোমাকে? এবারে ঠকবো না তো?
—না মা। সত্যিই বিয়ে করব। আপনি শুধু আশীর্বাদ করুন।
—আশীর্বাদ? কখনো করি নি যে। কি ভাবে করতে হয়? শুনতে খুব ভালো লাগছে। আমার আশীর্বাদের মূল্য আছে?
—হ্যাঁ। আছে। অশেষমূল্য।
—তবে আশীর্বাদ করব। আমাকে মা বলেছ। আমার সুচরিতাকে বিয়ে করতে চেয়েছ। তোমাকে আশীর্বাদ করব না?
ভদ্রমহিলা আমার মাথা দুহাতে টেনে নিয়ে কপালে চুমু খেয়ে বলেন
—এইভাবে তো?
—হ্যাঁ মা। এইভাবে। এবারে আমাকে একটু ভেতরে যেতে দেবেন? আমি আবার আসব। ওই যে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে সবুজ রঙের ঐ গাড়িতে ফিরব। আপনি ওখানে গিয়ে দাঁড়ান। কেমন আচ্ছা?
—আমি যাই?
—হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি আসবে তো?
—হ্যাঁ মা।
দিগম্বরের ড্রাইভার আমাকে দেখে হর্ন বাজায়। সে কি বুঝতে পারছে না, সমস্ত এয়ারপোর্টে কী সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে? হয়তো ঘুমিয়ে ছিল। হাত তুলে তাকে ইশারা করে ভেতরে চলে যাই।
কিন্তু প্লেন গেল কোথায়? আকাশে তো নেই? তবে কি সর্বনাশ হয়ে

গেল ? পেট্রল ফুরিয়ে গেল ? দাউ দাউ করে জ্বলছে !

পা দুটো ভারী হয়ে ওঠে। টেনে টেনে চলি।

ভেতরে গিয়ে দেখি সেই মেয়েটি হাততালি দিচ্ছে। তাঁর চোখে অশ্রু মুখে হাসি। সেই ভদ্রলোক চেঁচিয়ে চেঁচিয়েকথা বলছেন খুব।

প্রশ্ন করি—প্লেন নেমেছে ?

একজন আঙুল তুলে রান-ওয়ের দিকে দেখায়। প্লেনটি তখন বিরাট পাখা বিস্তার করে চাকায়ভর দিয়েইএগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। যেভাবে অভ্যর্থনা করা উচিত ছিল, সেভাবে সম্ভব হলো না কিছুতেই। আলতা। অপূর্ব বিষণ্ন মূর্তি তার। প্লেন থেকে একধাপ একধাপ করে নেমে সমতলে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখলাম। সে আমায় দেখল। উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে চেয়ে রইলাম।

কয়েকবার তার নাম ধরে ডাকলাম। সে কিন্তু একবারও ডাকলো না আমাকে। শুধু আমার গায়ের সঙ্গে গা ঘেঁষে চলতে লাগল।

কাস্টমস্ চেকিং—আরও নিয়মকানুনের পালা শেষ হলে, আমি বলি —গাড়ি এনেছি আলতা।

আলতার চোখ সজল হয়ে ওঠে। তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। তার হাত ধরে নিয়ে চলি।

জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নেই। একটা বড় স্যুটকেশ, একটা হোল্ড-অল আর এয়ার লাইনস-এর একটি ব্যাগ।

আলতাকে খুব যত্নের সঙ্গে গাড়িতে বসাই। সে সিট-এ দেহ এলিয়ে দিয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে। কেন কাঁদে বুঝতে পারি না। শুধু বুঝতে পারি এ সময়ে তাকে বাধা দেওয়া উচিত হবে না। মন আমার পরিপূর্ণ। মাথা ঠাণ্ডা।

ড্রাইভার প্রশ্ন করে—লাগেজগুলো পেছনে তুলে দেব ?

আমি বলি—হ্যাঁ।

ঠিক সেই সময় মিস ডাট্ ছুটে এসে বলেন—তুমি কাকে গাড়িতে তুলেছ ? এ তো সুচরিতা নয় ?

—না মা। এ সুচরিতা নয়।

আলতা চকিতে মুখের হাত সরিয়ে বড় বড় চোখে মিস ডাট্-এর দিকে চেয়ে থাকে।

—তবে? ওকে নামিয়ে দাও। তুমি কথা দিয়েছ আমার মেয়েকে বিয়ে করবে। আমার আশীর্বাদ পেয়েছ। তবে। তুমি বিশ্বাসঘাতক হলে?

—না মা। আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব। তাই বলে এঁকে কি নামিয়ে দেওয়া উচিত? এঁকে যে আমি নিতে এসেছি।

আলতা ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমে আসে। কাঁপা গলায় আমাকে বলে—শেষে তুমি আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করলে?

আমি ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ইঙ্গিতে তাকে চুপ করে থাকতে বলি।

—না। আমি চুপ করব কেন?

সে সোজা মিস ডাট-এর সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে—মাসীমা এ কি সত্যি কথা?

মিস ডাট্ ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকেন আলতার দিকে। তারপর বলেন—মাসীমা? আমি তোমার মাসীমা?

—আমাকে চিনলেন না? আমি সুচরিতার বন্ধু। নীলা।

—নীলা? ও হ্যাঁ হ্যাঁ। নীলা। চেনা চেনা—

—ইনি সুচরিতাকে বিয়ে করবেন?

—হ্যাঁ। কথা দিয়েছে। তাই ওর মা হয়েছি।

আমি আলতার হাত ধরতে যাই। সে ছিটকে দূরে সরে যায়।

আমি বলি—আলতা অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আগে বাড়ি চলো।

মিস ডাট্ সঙ্গে সঙ্গে বলেন—আমিও যাবো। তুমি আমায় নিয়ে যাবে না?

—হ্যাঁ মা। নিশ্চয় নিয়ে যাবে।

সেই সময় একটি খালি ট্যাক্সি পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আলতা সেটিকে থামিয়ে তার জিনিষপত্র তুলে নিতে বলে।

আমি এবার চেঁচিয়ে উঠি—আলতা। আবার একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যাচ্ছে।

—না। আর ভুল নয় দীপ্তেনদা।

আমি তার দিকে এগিয়ে যেতে গেলে মিস ডাট্ আমার হাত চেপে ধরেন—চলো। ওর জন্যে অমন করছ কেন? তুমি কি ওকে ভালবাসো? তুমি তো আমার মেয়েকে বিয়ে করবে।

আমার ধৈর্য থাকে না। মনে হয় এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আশীর্বাদের কথা ভাবি।

ট্যাক্সিতে জিনিষপত্র উঠিয়ে ফেলে ড্রাইভার। আলতা একবার আমার দিকে চায়। সেই চাহনিতে অসহায়তা। তাকে চমকে দেব বলে যে কথা এতোক্ষণ বলি নি, সেই কথাই বলতে হলো। বলি—তুমি জনক রোডে চলে যাও। তোমার বাবা সেখানে ফিরে এসেছেন। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

ট্যাক্সি চলে যায়।

মিস ডাট্-এর মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে। বলেন—বেশ হয়েছে। এবারে চলো।

—চলুন।

দিগম্বরের ড্রাইভার সব কিছুই দেখল। কিন্তু তার মধ্যে এতটুকুও ভাবান্তর দেখলাম না। সে শুধু বলে—কোথায় যাব?

আমি ভদ্রমহিলার বাড়ির রাস্তার নাম বলি।

বাড়ির সামনে পৌঁছোলে ভদ্রমহিলা বলেন—থামলে কেন?

—আপনার বাড়িতে এলাম।

—না না। আমি নামব না।

—তবে? কোথায় যাবেন?

ভদ্রমহিলা অবুঝের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন—আমি জানি না।

এবারে আমার বিপদ হলো। কি করে তাঁকে এখন নামানো যায় ভাবতে থাকি।

দিগম্বর বাড়িতেই ছিল। আমাকে দেখে সে অবাক হয়। বলে—কি রে? এলো না?

ঘাড় কাত্ করে জানাই এসেছে।

—তবে? এ ভাবে চলে এলি? ও কি বিয়ে কা

ঘাড় নাড়িয়ে বলি যে বিয়ে সে করে নি।

—তা হলে? খুব অসুস্থ নাকি?

চেঁচিয়ে উঠি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত জেরার জবাব দেব? বসার জায়গা নেই এত বড় বাড়িতে?

দিগম্বর বোধহয় ভয় পেয়েই তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে তার বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসায়। সে নিজে একটা চেয়ারে বসে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

আমি আর থাকতে পারি না। দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরি। আমার দেহটা ঝাঁকি দিতে থাকে। একটা অসীম যন্ত্রণা। অথচ এক ফোঁটা অশ্রু নেই।

অনেক পরে শান্ত হয়ে একে একে সব ঘটনা বলে যাই। দিগম্বর খুবই মন দিয়ে শোনে। শেষে তার মতো শান্ত স্বভাবের মানুষও জ্বলে উঠে বলে—কথায় কথায় এত ভুল বোঝার ক্ষমতা রয়েছে যার, তাকে আর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে কাজ নেই। ছেড়ে দে।

—কিন্তু দিগম্বর। তুই বুঝছিস না। সে যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে পৃথিবীর ওপর। সেই বিশ্বাস আমি ছাড়া আর কে ফিরিয়ে আনতে পারবে? কেউ পারবে না। ওর জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। শেষে সুচরিতার পথ বেছে নেয় যদি?

এবারে দিগম্বর আপন মনে ভেবে চলে। অনেকক্ষণ পর আমাকে বলে

—আমি তোকে যা বলব, তাই করবি?

—কি?

—আগে প্রতিজ্ঞা কর। ঠিক আমি যা বলব তাই করতে হবে। এতোদিন তো নিজে নিজেই দেখলি। এবারে বন্ধুর পরামর্শ নে।

—বেশ।

দিগম্বর ভেতরে চলে যায়। একটু পরে একটা খবরের কাগজ নিয়ে আসে। একটা লাল লাল পেনসিলের দাগ দেওয়া হেডিং দেখা যায়। সে কাগজটিকে ভাঁজ করে আমার হাতে দিয়ে বলে—এইটি শুধু জনক রোডে পৌঁছে দিয়ে আয়।

—যদি দরজা না খোলে?

—ওর বাবা রয়েছেন বললি না?

—হ্যাঁ।

—তিনি খুলবেন আশা করা যায়।

—বেশ। কিন্তু কিসের হেডিং ওটা।

—সুচরিতাদের মৃত্যুর খবর। যা, আমার গাড়িটা নিয়ে যা। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি ড্রাইভ করে নিয়ে।

গাড়ি চালাতে চালাতে দিগম্বর বারবার সাবধান করে দেয়—আর কখনো ওদিকে যাবি না। তুই বড় সস্তা হয়ে গিয়েছিস। ওস্তাদের মারটা কেমন হয় জানিস না।

ওদের বাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাবি, আলতা এখানে উঠেছে তো? মানসীর বাড়ি যদি চলে যায়?

জনক রোডে ওদের বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই বুঝতে পারলাম আলতা এসেছে। কারণ পাশের সব বাড়ির কার্নিশ, জানলা, ছাদে তখনো অনেক মুখ। দিগম্বর গাড়িতে বসে থাকে। আমি ওপরে উঠি। বেল টিপ্‌তেই দরজা খুলে যায়। অলকেশবাবু আর আলতা দুজনাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে আলতা ভেতরে চলে যায় আর অলকেশবাবুর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে।

—কি চাই?

—কিছু না। এটি আলতাকে দেবেন দয়া করে।

উনি খবরের কাগজ হাতে নেন। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেন—তুমি আমার অশেষ উপকার করেছ, তার জন্যে ধন্যবাদ

এবারে যেতে পারো।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে গাড়িতে বসি।

দিগম্বর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলে—খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলি দেখছি। নিয়েছে তো

—হ্যাঁ।

—এবারে চল্ তোকে বাড়ি পৌঁছে দি

—না কারখানা নিয়ে চল্।

—কিন্তু খাওয়া-দাওয়া? সেই সকালে বার হয়েছিলি।

—খেয়ে নেব কিছু বাইরে থেকে।

কারখানার দিকে এগিয়ে চলে গাড়ি।

বেশ রাত করে পাড়ায় এসে পৌঁছোই। জানি, মা আমার জন্যে অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন। তিনি হয়তো ভাবছেন, আলতার সবকিছু ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করে দিতে আমার এতো দেরি হচ্ছে। মায়ের সামনে কোন্ মুখে দাঁড়াব বুঝতে পারি না। তাঁর প্রশ্নের জবাবে কি উত্তর দেব? প্রতিদিনের মতো বারান্দায় উঠে ডাকি—মা।

মা বাইরে বার হয়ে আসেন। হাসি-খুশী মুখ তাঁর। দেখে আরও বিষণ্ণ হই।

—এতো দেরি করলি কেন?

—কারখানায় গিয়েছিলাম।

—আজকের দিনে কারখানায়? তোর মাথা খারাপ হলো নাকি?

আমি কিছু বলতে পারি না। কি বলব? নিজের ঘরের দিকে যেতে গেলে, মা বলেন—আমার ঘরে আয় আগে।

সেখানে বসিয়ে হয়ত আলতা সম্বন্ধে জানতে চাইবেন। বলি—চল্।

তাঁর ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠি। অলকেশবাবু ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন—দীপু, আমাকে ক্ষমা করো।

কি বলব ভেবে পাই না।

মা বলেন—এক ফোঁটা ছেলের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কি আছে। আপনি অন্যায় তো কিছু করেন নি।

—না। আমি ভীষণ অন্যায় করেছি। এ অন্যায়ের ক্ষমা নেই। এ যে কত বড় আঘাত—

মা বলেন—ঠিক আছে। আপনি তো আমাকে সবই বলছেন। আমি বুঝেছি। ওর কাছে আর নতুন করে কিছু বলতে হবে না।

দিগম্বরের কথা ভাবি। আমি কি সত্যিই সস্তা হয়ে পড়েছিলাম?

মা আমাকে বলেন—যা তোর ঘরে যা। আমি এঁর সঙ্গে দুটো কথা বলব।

আমার নিজের শয়নকক্ষে অপেক্ষা করছিল চূড়ান্ত বিস্ময়। আলতা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে দেখে তার ওষ্ঠদ্বয় থরথর করে কেঁপে উঠল। তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

—আলতা।

আলতা এগিয়ে এসে দুই হাতে আমার গ্রীবা-দেশ বেষ্টন করে ভেঙে পড়ে।

—আলতা।

কি যেন বলে আলতা। বলার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। কিন্তু কোনো কথাই হয় না।

মা ডাকতে শুরু করেন নিজের ঘর থেকে। আমি রুমাল বার করে আলতার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলি—শিগ্‌গির চলো। নইলে মা নিজেই চলে আসবেন।

ক্রিকেটের ছুটন্ত বল অনেক উইকেট ভাঙে, অনেক ব্যাটের কানায় লেগে শ্লিপে ক্যাচ তোলে, কখনো জায়গা মতো ব্যাটে লেগে ঝড়ের গতিতে বাউণ্ডারী পার হয়ে যায় এমন অনিশ্চয়তা কোনো খেলাতেই নেই। আশা হতাশা, আনন্দ উত্তেজনা—মুহূর্মুহু পট পরিবর্তনের শক্তিতে সিদ্ধিলাভ করে এই ক্রিকেট এক অসম্ভব আবেদন সৃষ্টি করেছে মানু-

ষের মনে। কিন্তু মানুষ ভেবে দেখে না কেন এই আবেদন। সে ভেবে দেখে নি তারই জীবনের প্রতিচ্ছবি এই ক্রিকেট। কখনো একদিনের, কখনো তিনদিনের, কখনো বা পাঁচ-ছ'দিনের খেলায় তারই মিনি-জীবনকে প্রত্যক্ষ করে তন্ময় হয় সে। এর স্বাদ যতই অতুলনীয় হোক, প্রতিবারই মনে হয় এ যেন অনাস্বাদিতপূর্ব।

জনক রোডের আলতাদি এখন আমার আলতা। এই আলতার সঙ্গে পরিচয় ক্রিকেটের মাধ্যমে ব'লেই এতো অল্প সময়ের মধ্যে এই নিদারুণ উত্থান-পতনের সম্মুখীন হতে হলো। শেষপর্যন্ত রবার ভাগাভাগি। দিগম্বর বলে আম্পায়ার ছিল না বলেই এই দশা হয়েছিল। গোড়া থেকে তাকে আম্পায়ার হিসাবে মনোনীত করা হলে টেস্ট সিরিজের ফয়সালা অনেক আগেই হতে পারতো।

আলতা আমার দিকে চেয়ে হেসে বলে—আম্পায়ার না থেকে ভালোই হয়েছে।

সে ইতিমধ্যেই মায়ের অনুগত শিক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ বেশ গম্ভীরভাবে সে মন্তব্য করে—অগ্নি পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল।

মাকে আমি কিছুদিন আগে প্রকাশিত কয়েকখণ্ড রামায়ণ কিনে দিয়েছি। এখন ভাবছি ভালো করি নি। কারণ মা আর আলতা উভয়েই আজকাল সব কথাবার্তায় সদ্য পঠিত রামায়ণের রেফারেন্স টেনে বলেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

সুর নৃত্যের উর্বশী ১০.০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পরবর্তী আকর্ষণ ১০.০০

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শংকর নর্মদা ১৬.০০

হেলেন, ট্রয়ের হেলেন ১০.০০

বিমল কর

পাশাপাশি ৮.০০

চিরঞ্জীব সেন

আবার বারমুডা ট্র্যাঙ্গল (যন্ত্রস্থ)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ঝংকার ১০.০০